মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের

কাশীবাস গ্রন্থের পরিশিষ্ট।

পণ্ডিত ৺হরকুমার-শাস্ত্রি-বিরচিত।

শ্রীদক্ষিণাচরণ তর্কনিধি-সংগৃহীত।

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৩।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

ভূমিকা।

পূজ্যপাদ ৺হরকুমার শাস্ত্রি-মহাশয় বসন্তরোগাক্রান্ত হওয়ায় জীবন-রক্ষায় সন্দিহান হইয়া আমাদের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি অতি যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া 'কাশীবাস' গ্রন্থের অদ্বৈতবাদখণ্ডন-পরিশিষ্ট লিখিয়াছি। বড়ই ইচ্ছা ছিল, শীঘ্রই মুদ্রিত করিব; কিন্তু বোধ করি, তাহা আমা হইতে সম্পন্ন হইল না।" শাস্ত্রি-মহাশয়ের জীবনান্তে তাঁহার পিতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদের প্রমুখাৎ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমাদিগকে আদেশ করিলেন যে, শীঘ্রই ঐ পরিশিষ্ট মুদ্রিত করাইবার চেষ্টা কর, এবং ঐ পরিশিষ্টের সহিত হরকুমারের যৎকিঞ্চিৎ জীবনচরিত যাহাতে প্রকাশিত হয়, তদ্বিষয়েও যত্ন কর। গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে ঐ পরিশিষ্টখানি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিলাম। হরকুমারদাদা আমাদের প্রাণ লইয়া গিয়াছেন, এক্ষণে জীবনশূন্যদেহে নিভৃতস্থানে বসিয়া কেবল নয়নের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে দিনযাপন করিতেছি; এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তৃক জীবনচরিত লেখা নিতান্ত অসম্ভব; তবে গুরু-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, এই হেতু তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। নয় বৎসরকাল যাবৎ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ তাঁহার বাটীতে অবস্থান করিতেছি। এই নয় বৎসর একত্র অবস্থিতি, ভোজন, ভ্রমণ প্রভৃতি যাবৎকর্ম্মেই শাস্ত্রি-মহাশয়ের সঙ্গী ছিলাম। তিনি কনিষ্ঠভ্রাতৃভাবে আমাদিগকে ভালবাসিতেন; কোন বিদেশে যাইতে হইলে প্রায় আমাদের একতরকে সঙ্গে না লইয়া যাইতেন না। তিনি আমাদের নিকট কোন কথাই গোপন করিতেন

না। এই নয় বৎসর একত্র অবস্থানে তাঁহার চরিত্র ও ব্যবহার বিশেষ-রূপে অবগত আছি এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রমুখাৎ তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্তও অবগত হইয়াছি। এক্ষণে যথাজ্ঞান শাস্ত্রি-মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত এই পরিশিষ্টের শেষে প্রদর্শিত হইল।

আজকাল বাঙ্গালাভাষায় বহু গ্রন্থই হইতেছে, এবং নিজের গুণপণা দেখাইবার জন্য সেই সেই পুস্তক অভিজ্ঞগণের নিকট সকলেই প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেই সকল পুস্তক পাইয়া অভিজ্ঞগণ তন্মধ্যে অনেক গ্রন্থেরই দুই এক পাতা মাত্র দেখিয়াই তুলিয়া রাখেন। তাহা অনুচিত নহে, কারণ, অসংখ্য পুস্তকের আদ্যোপান্ত দেখিতে হইলে তাঁহাদের বিষয়-কার্য্য করা দূরের কথা, আহার-নিদ্রা করিবারও সময় পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা, হরকুমার শাস্ত্রিকৃত এই পরিশিষ্টখানি যেন আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করেন। একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি-কৃত শাস্ত্রার্থতত্ত্বনির্ণয়বিচারের প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি প্রণীত হইয়াছে। অতএব সম্ভাবনা করি, এই পরিশিষ্ট গ্রন্থখানি অভিজ্ঞগণের সন্তোষকর হইবে এবং হরকুমার শাস্ত্রি-মহাশয়কে বহু মহোদয় ব্যক্তি একান্ত স্নেহ করিতেন, আমাদের বিশ্বাস, এজন্য মহোদয়গণ তাঁহার জীবন-চরিত অংশটী আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিতে বিরক্ত হইবেন না।

জ্ঞাত্বা হরে হরকুমারচিরানুরাগং
শিষ্টত্বমস্য পিতুরিষ্টকৃতিব্রতঞ্চ।
স্নেহোঽজনীহ মহতামিতি জন্মবার্ত্তা
তস্যাদ্য কিং শ্রুতিপথে ন পতেদমীযাম্॥

৪ঠা অগ্রহায়ণ,
সন ১৩১৩।

শ্রীদক্ষিণাচরণ তর্কনিধি।

পুনশ্চ—

মুক্ত হরকুমার দাদার একান্ত ভালবাসার পাত্র ও আমাদের প্রিয় বন্ধু বসুমতীর সুদক্ষ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শাস্ত্রী এই পুস্তক মুদ্রনকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের কোন স্থানে অশুদ্ধ বোধ হইলে মহোদয়গণ শুদ্ধিপত্র-খানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। এই পুস্তক এবং কাশীবাস পুস্তকের জন্য পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে ৺কাশীধাম সোনারপুরা B. ১৩।১৮৫নং বাটী এই ঠিকানায় অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যেন প্রেরণ করা হয়।

শ্রীদক্ষিণাচরণ তর্কনিধি।

পোঃ বুদ্‌বুদ্, গ্রাম জাঁহাপুর, জেলা বর্দ্ধমান।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন।

৺হর কুমার শাস্ত্রী।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

নিঃশেষ-মঙ্গলাবাস-বিশ্বেশমহমাশ্রয়ে।
নিঃশ্রেয়সায় বিশ্বেষাং যেন কাশী প্রকাশিতা ॥
শ্রিয়া হরকুমারেণ ময়া পিতুরনুজ্ঞয়া।
পরিশিষ্টমিদং সৃষ্টমস্ত শিষ্টস্য তুষ্টয়ে ॥
কাণাদে গৌতমে গ্রন্থে বিশ্বাসাদ্‌বাক্যমীদৃশম্।
প্রযুক্তং তদযুক্তত্বেঽপ্যহং তস্মান্ন দোষভাক্ ॥

পূজ্যপাদাম্বুজ পিতৃদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে "কাশীবাস"গ্রন্থের অদ্বৈতবাদখণ্ডন-পরিশিষ্ট প্রকাশ করিবার জন্য আমি যে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা কাঠবিড়ালীর সাগরবাঁধা-চেষ্টার সমান। তবে যাহার যেটুকু ক্ষমতা থাকে, সে ব্যক্তি তাহা প্রকাশ করিতে নিবৃত্ত হয় না, পিপীলিকা হইতে সিংহ পর্য্যন্ত এই নিয়মই দেখা যায়। এই গ্রন্থখানি সামান্য হইলেও মহাত্মগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষণীয় হইবে না, ইহা আমার বিশ্বাস ; কারণ, সম্পূর্ণ উপচার না থাকিলে গন্ধ, পুষ্প অথবা কেবল জলও সুমনোব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীহরকুমার শাস্ত্রী।

ভ্রমশোধন।

প্রাণসম হরকুমার-বিয়োগে আমাদের চিত্ত যে কিরূপ হইয়াছে, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। এ অবস্থায় চিত্তভ্রংশ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। একটী বিষয় জীবনচরিত-মধ্যে সংশ্লিষ্ট করিতে বিস্মৃত হওয়ায় বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছি। সেই অনুতাপ-নিবৃত্তির জন্য এই ভ্রমশোধন পত্র প্রকাশ করিতেছি।

শাস্ত্রী মহাশয় যে সময় বসন্ত-রোগে শয্যাগত ছিলেন, সে সময় তাঁহার স্নেহের পাত্র কনিষ্ঠভ্রাতৃসম বর্দ্ধমান মলানদীঘী-নিবাসী শ্রীযুক্ত বগলানন্দ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, বর্দ্ধমান কুমারডিহি-নিবাসী শ্রীযুক্ত ধরণীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও বর্দ্ধমান জাঁহাপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়ের যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছেন, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে। সেরূপ শুশ্রূষা যে কেহ করিতে পারে, ইহা আমার বোধ নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ও ইহাঁদের শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া সে সময় বলিয়াছিলেন—"ভাই, তোমাদিগকে যে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতাম, তাহার প্রতিদান তোমরা যথেষ্ট দিয়াছ। তোমাদিগকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব; তোমরা সুখী হও।" ইহাঁরা সকলেই কাশীতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। উক্ত শ্রীযুক্ত ধরণীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বসন্ত-রোগাক্রান্ত দাদামহাশয়ের এক শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছেন। ব্যাকরণাদিতে ব্যুৎপন্ন, ন্যায়শাস্ত্রে প্রবিষ্ট, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র ও শিষ্য উক্ত শ্রীযুক্ত বগলানন্দ ভট্টাচার্য্য ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিশেষ সেবার্থ সেই সময় হইতে তাঁহারই বাটীতে রহিয়াছেন। গুরুদেব ন্যায়রত্ন মহাশয় ইহাঁদিগকে পূর্ব্বে স্নেহ করিতেন। অসময়ে তাঁহার পুত্রের এরূপ সেবা দেখিয়া তদবধি ইহাঁদিগকে প্রাণতুল্য ভালবাসিয়া থাকেন ও ইহাঁদের একান্ত হিত চিন্তা করেন।

শ্রীদক্ষিণাচরণ তর্কনিধি।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৪	যাঁহার	যাঁহারা
৮	১২	সৎশাস্ত্রের	সর্ব্বশাস্ত্রের
,,	,,	হইতে	ইহাতে
,,	১৪	বিধিয়	বিধির
,,	১৯	মতেও	মতে
৯	১	উপনিষদ্‌বাক	উপনিষদ্‌বাক্য
,,	৪	ঈক্ষ	ঈক্ষা
১২	২	দ্বৈতবাদীকর্ত্তৃক	দ্বৈতবাদিকর্ত্তৃক
১৫	২৪	মাপ্লুয়াৎ	মাপ্নুয়াৎ
১৬	৯	যস্তর্কে	যস্তর্কে
,,	২১	পিণ্ডতেরই	পণ্ডিতেরই
,,	,,	গঙ্গোপাধ্যায়	গঙ্গেশোপাধ্যায়
,,	২২	আন্বিক্ষিকীং	আন্বীক্ষিকীং
,,	২৩	উদয়নাচার্য্য	উদয়নাচার্য্য
১৮	৭	উপনিষদাদির	উপানযদাদি
১৯	১০	স্বষ্টিগেগৌতম	স্বষ্টিগৌতমা
২৯	১৮	ব্যবহারিক	ব্যাবহারিক
,,	২৩	,,	,,
৩২	১৮	করনে	করেন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪	১০	চিরাবস্থাই	চিরাবস্থায়ই
,,	২২	প্রিয়ান্তরৈঃ	ক্রিয়ান্তরৈঃ
৩৫	৯	ইহাতে	ইহা তো
৩৮	২২	আন্বীক্ষিকীং যদ্দশনদ্বিমালাং	আন্বীক্ষিকী যদ্দশনদ্বিমালী
৪৩	২	পূর্ব্বপ্রতীর অঙ্গ	পূর্ব্বপ্রতীর সঙ্গ
,,	১১	কাশীনেরেশস্য	কাশীনরেশস্য
৫৩	৫	অসাধারা	অসাধারণ
৬০	১১	ধোরে	ঘোরে
,,	১৭	রুক্ষ	রুক্ষ্ম
৬১	১	নাম	নমি
,,	৬	ক আত্মবিবেক	কি আত্মবিবেক
৬২	৩	প্রস্তু ললাটে	প্রশস্ত ললাটে
,,	১৭	ব্রহ্মণপণ্ডিতোচিত	ব্রাহ্মণপণ্ডিতোচিত
৭৫	১	আমার	আপনার
৭৬	১২	স্বতুকলং	স্বাতুকলং
৮৫	১৫	সসয়	সময়
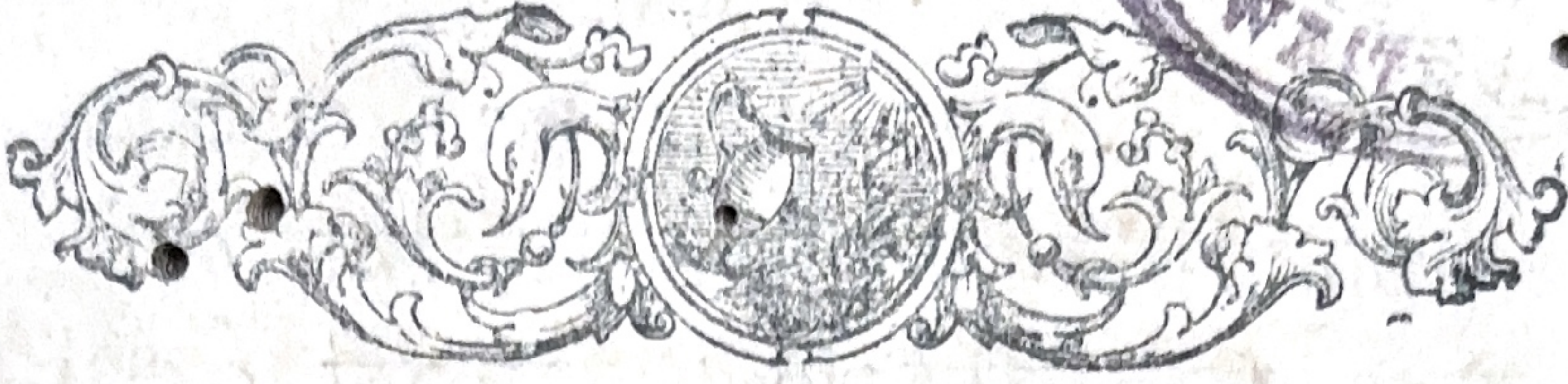
কাশীবাস গ্রন্থের

অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন পরিশিষ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যখণ্ডন, উপনিষদ্‌বাক্যের বিচার
ও তাৎপর্য্যাবধারণ, সন্দিগ্ধ পদার্থের একতর
নিশ্চয়ার্থ তর্কোদ্‌ভাবনের আবশ্যকতা,
ন্যায়মতে ব্রহ্মনিরূপণ ও যৎপদ-
ঘটিত বাক্যবিচার।

কোনও কোনও অদ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদে প্রামাণ্য-সন্দিহান ব্যক্তি-গণের সংশয়-নিবৃত্তি করিবার আশায় যেরূপ বাগ্‌বিস্তার করিয়া থাকেন, তাহা এই,—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের দ্বারা এবং উপনিষদ্-গ্রন্থসমূহের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য; এবং জীব-মাত্রেই ব্রহ্মের স্বরূপ। ঐ সকল গ্রন্থে অদ্বৈত-সাধক ঝুড়ি ঝুড়ি বচন রহিয়াছে। অধিক কি বলিব, যাঁহার

যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত জানেন, তাঁহারাও ঐ গ্রন্থ শুনিয়া অদ্বৈত-সিদ্ধি-সুধা-পান করতঃ উন্মত্ত হইয়া উঠেন। ঐ সকল গ্রন্থ দেখিলে অধুনাতন যাবৎ তার্কিকেরই ভ্রম-সংশোধন হইয়া যায়। এ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের উত্তর এই,—যোগবাশিষ্ঠাদি গ্রন্থে অদ্বৈত-সিদ্ধি-সম্বন্ধে কোটি কোটি বচন থাকিতেও অস্ফুট কতকগুলি উপনিষদ্‌বাক্য দেখাইয়া এবং আবশ্যকমত উপনিষদ্‌বাক্যের ন্যায় কতকগুলি বাক্য নিজে রচনা করিয়া শঙ্করাচার্য্য নিজ-কৃত ভাষ্যের পুষ্টি করিলেন কেন? এবং সরল সংস্কৃতে রচিত যোগবাশিষ্ঠাদি গ্রন্থ থাকিতেও গৌতম কণাদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ দ্বৈতমতের পুষ্টি কি সাহসে করিয়াছেন? তবে কি তাঁহারা যোগবাশিষ্ঠাদি গ্রন্থকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না?

স্বমরীচিবলোদ্ভূতা জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব।
সর্ব্বা এবোত্থিতা রাম ব্রহ্মণো জীবরাশয়ঃ॥

যোগবাশিষ্ঠের এই বচন দ্বারা জীব ব্রহ্মের স্ফুলিঙ্গস্বরূপ, ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াও গৌড়পাদ কারিকা করিলেন, "নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা। নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা॥" ইহার ভাবার্থ এই, ঘটাকাশ যেরূপ আকাশের বিকার বা অবয়ব নহে, সেইরূপ জীবগণ ব্রহ্মের বিকার বা অবয়ব নহে। অদ্বৈতবাদিগণের ব্যবস্থা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি। "এখন বল, মা আমি দাঁড়াই কোথা?" জীবকে ব্রহ্মের স্ফুলিঙ্গস্বরূপ অবয়ব বুঝিব, না আকাশ ঘটাকাশাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বুঝিব? ফল কথা, যোগবাশিষ্ঠ যে অপ্রমাণ গ্রন্থ, ইহাই গৌড়পাদের অবধারণ হইয়া থাকিবে। যদি প্রমাণ বুঝিতেন, তাহা হইলে স্ফুলিঙ্গবাদ উপেক্ষা করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। অথবা ঐ গ্রন্থখানি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত

স্বর্গেই ছিল, সম্প্রতি পৃথিবীতে আসিয়াছে, ইহাই বিজ্ঞলোকের বিবেচনা করিতে হইবে।

উপনিষদ্-সম্বন্ধে একটু বিচার করা আবশ্যক। যদি অদ্বৈতসিদ্ধির সুস্পষ্টরূপ অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃতজ্ঞ সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য উপনিষদের কোটি কোটি বাক্য থাকিল, তবে সকল উপনিষদাদির অর্থাবধারণ করিতে মহর্ষিগণের আবার তর্কানুসন্ধান করিতে হইয়াছিল কেন? তাঁহারা যে তর্কানুসন্ধান করেন নাই, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? প্রমাণ যে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। প্রমাণ যথা,—

তত্রোপনিষদঞ্চৈব পরিশেষন্তু পার্থিব।
মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীং পরাম্॥

আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ গৌতমোক্ত তর্কবিদ্যা, ইহা সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই সম্মত। অথবা অন্যরূপ তর্কবিদ্যা যদি থাকে থাকুক, সে বিচার এক্ষণে অনাবশ্যক। এই বচন দেখিয়া সুধীগণ ইহাও স্থির করিবেন যে, উপনিষদাদি সকল শাস্ত্র অপেক্ষা তর্কশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ, ঐ বচনে উপনিষদাদির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাতে পরাদি শব্দের যোগ না করিয়া আন্বীক্ষিকী শব্দে পরা শব্দের যোগ করিয়াছেন। এক্ষণে উপনিষদ্‌বাক্যের ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছি। তাহা শুনিয়া অদ্বৈতবাদি-গণের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিবার সম্ভব। অতএব এই সময় বলিয়া রাখিতেছি, "তত্রোপনিষদঞ্চৈব" এই বচনটী স্মরণ করিয়া তাঁহারা যেন হৃদয়ের সন্তাপ নিবৃত্তি করেন।

ব্যাস-বচন দেখিয়া বুঝা যায়, ঋষিগণ উপনিষদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার নিঃসংশয়ে অর্থাবগতির জন্য আন্বীক্ষিকীর সাহায্য লইয়াছেন। উপনিষদে সুস্পষ্টরূপ অদ্বৈত-সাধক বহুপ্রমাণ দেখিয়াও

ঋষিগণের কি জন্য সংশয়-নিবৃত্তি না হইয়াছিল, যে সংশয়-নিবৃত্তির জন্য দুরূহ তর্কানুসন্ধান-বিষয়ে আয়াস করিতে হইয়াছে? এ আশঙ্কা সঙ্গত বটে। ইহার সমাধান মীমাংসাভিজ্ঞ দূরদর্শিগণই করিতে সমর্থ। বাক্য তিনপ্রকার;—বিধি, নিষেধ ও অর্থবাদ। ইহা জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থকার গদাধর ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যথা,—"বিধিনিষেধার্থবাদভেদাদ্বাক্যং ত্রিবিধম্।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ঐ তিনপ্রকার ভিন্ন আর বাক্য নাই। কোন কোন প্রামাণিক গ্রন্থকার নিষেধ-বাক্যকেও বিধিবাক্য বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে বেদ দুই প্রকার;—বিধি ও অর্থবাদ। ইষ্টসাধনত্ববোধক বাক্য বিধিবাক্য, দ্বিষ্টানুবন্ধিত্ববোধক বাক্য নিষেধ-বাক্য। ঐ দ্বিবিধ বাক্য ভিন্ন যাবৎ বাক্যই অর্থবাদ। অর্থবাদও বহুবিধ;—কোনও অর্থবাদ স্তুতিবাদাত্মক, কোনও অর্থবাদ বিধির উত্থাপক, কোনও অর্থবাদ নিষেধ-বাক্যের অনুমাপক, কোনও অর্থবাদ প্রমাণান্তর-পরিশোধিত অর্থের অবিরোধি-অর্থ-প্রতিপাদক।

স্তুতিবাদাত্মক অর্থবাদ যথা,—"কচ্চি ত্বং স্থাবরস্থাসি সদাসিদ্ধি-প্রদায়িনী," "ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতনামাসি বন্দিতাসি সুরাসুরৈঃ।" ইত্যাদি, "আয়ুর্ঘৃতং" "ঘৃতমমৃতং" ইত্যাদি অর্থবাদ, "পুষ্টিকামো ঘৃতং পিবেৎ" এই বিধির উত্থাপক। "কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাৎ।" ইত্যাদি অর্থবাদ "প্রতিপদাদৌ কুষ্মাণ্ডাদিকং ন ভুঞ্জীত" এই নিষেধের অনুমাপক। প্রমাণান্তর-পরিশোধিতের অবিরোধি-অর্থপ্রতিপাদক অর্থবাদ যথা,—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীং,"—ইত্যাদি। এইরূপ বহু উদাহরণ আছে, গৌরবভয়ে প্রদর্শিত হইল না। অর্থবাদাত্মক বাক্য অতিদুর্ব্বল, তাহার কারণ, গুরু প্রভৃতি মীমাংসকগণ অর্থবাদের প্রামাণ্যই স্বীকার করেন নাই। তার্কিক ও অদ্বৈতবাদীরা প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকল অর্থবাদের যে সুসঙ্গত অর্থবোধকতা

আছে, ইহা কোনও দূরদর্শী স্বীকার করেন না. যেহেতু, "পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা" "কুষ্মাণ্ডং নালিকাশাকং বৃন্তাকং পৌতিকং তথা। ভক্ষয়ন্ পতিতস্তু স্যাদপি বেদান্তগো দ্বিজঃ।।" "তুষ্টায়াং নৃপ দুর্গায়াং নিমেষার্দ্ধেন যৎ ফলম্। ন তদ্‌বক্তুং মহেশোঽপি শক্তঃ কল্পশতৈরপি।।" ইত্যাদি অসংখ্য বাক্যই বাধিতার্থক দেখা যায়। বাক্যমাত্রেরই দর্শিত ত্রিবিধ বিভাগ থাকায় বুঝিতে হইবে, বিধি-প্রত্যয়-শূন্য উপনিষদ্‌বাক্যগুলিও সমুদয় অর্থবাদাত্মক। তন্মধ্যে—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞা ন ঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।
অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্য-
মব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং
চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।"

ইত্যাদি বহুবিধ বাক্যই ব্রহ্মের স্তুতিবাদাত্মক; "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যাদি বাক্য-সকল প্রকৃতার্থ-বোধক, কিংবা ভাবনারূপ উপাসনা-বিধিকল্পক, এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে; সেই সংশয়ের নিবৃত্তি করিবার জন্য তর্ক-উদ্‌ভাবন করিয়া ভাবনারূপ উপাসনাবিধির অনুমাপকত্বের অবধারণ করিতে হইবে। তর্ক বিনা ঐ দর্শিত সংশয়-নিবৃত্তির আর কোন উপায়ই নাই। তর্কের আকার এই—"জীবো যদি ব্রহ্মাভিন্নঃ স্যাৎ, তদা মিথ্যা-জ্ঞানজন্যবাসনাদিমদন্যঃ স্যাৎ।" যাবদ্‌বস্তুতে ব্রহ্মের অভেদসিদ্ধির প্রতি-কূল তর্ক "কাশীবাস" গ্রন্থে "কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ—" এই ব্যাসসূত্রব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐরূপ তর্কদ্বারা এবং কাশীবাস গ্রন্থে প্রদর্শিত

ভগবদ্গীতা প্রভৃতি বহু মহাবাক্য দ্বারা ও লৌকিক ব্যবহার দ্বারা "অণুরপি বিশেষোঽধ্যবসায়করঃ" এই ন্যায়বলে নিখিল জীবে এবং নিখিল ভূতে যদি ভেদসিদ্ধি হইল, তবে দর্শিত অর্থবাদগুলিতেও বিধির উত্থাপকত্ব নিশ্চয় করিতে অণুমাত্র বাধা দেখিতেছি না। অধিক কি, গীর্ব্বাণগুরু প্রভৃতিও ঐ নিশ্চয়ের অন্যথা করিতে সক্ষম নহেন, ইহাই তার্কিক-গণের ধ্রুব বিশ্বাস। সুতরাং উপনিষদ্ অধ্যয়নের পর তর্ক-উদ্ভাবনের বিশেষ আবশ্যকতা থাকায় ঋষিগণের তর্ক-উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিটী "সর্ব্বং ব্রহ্মত্বেন ভাবয়েৎ" এই বিধির উত্থাপক; এবং "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতিটী ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা-তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়া "ব্রহ্মাবশ্যমুপাসীত" এই বিধির অনুমাপক; "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই বাক্যটী "ব্রহ্মত্বেনাত্মানং ভাবয়েৎ" এই বিধির উত্থাপক। সংক্ষেপে দেখাইলাম, বহু উপনিষদ্‌বাক্যের এই রীতি অবলম্বন করিয়াই উপপত্তি করিতে হইবে। উপনিষদ্-সম্বন্ধে যেরূপ মীমাংসা প্রদর্শিত হইল, সেই মীমাংসা অবলম্বন ব্যতিরেকে "তত্রোপনিষদঞ্চৈব" ইত্যাদি বাক্যের অগতি-নিবৃত্তি করিবার আর কোনও উপায় নাই।

অর্থবাদ মাত্রেই দুর্ব্বল, বিশেষতঃ স্তুত্যাত্মক অর্থবাদ যে অতিদুর্ব্বল, ইহা স্কন্দপুরাণীয় প্রমাণ দ্বারাও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রমাণ যথা—

নার্থবাদোঽয়মুদিতঃ স্তুতিবাদো ন বৈ মুনে।
সত্যং যথার্থবাদোঽয়ং শ্রদ্ধেয়ঃ সদ্ভিরাদরাৎ॥

এখন এই বচন দেখিয়া আমরা কি বুঝিলাম? বুঝিলাম এই, অর্থবাদের অনেকাংশ, বিশেষতঃ স্তুতিবাদ প্রমাণরূপে গণ্য হয় না। প্রমাণ হইলে ঐ স্কন্দপুরাণীয় বচনটী অর্থবাদ ও স্তুতিবাদের নিন্দা-তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইত না। মীমাংসকগণও "ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তাস্তি বেদস্মর্ত্তা

চতুর্ম্মুখঃ” এই মহাবাক্য দেখিয়া অবধারণ করিয়াছেন, বেদ নিত্য। কিন্তু নিত্য স্বীকার করিলেও অবাধিতার্থক বেদই প্রমাণ, অপর বেদ প্রমাণ নহে। তাঁহাদের যে ইহাই মত, তাহা তাঁহাদের কৃত সূত্রদ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সূত্র যথাঃ—“নিত্যনির্দ্দোষতয়া বেদস্য প্রামাণ্যম্।” এক্ষণে দূরদর্শিগণ বিবেচনা করুন্, মীমাংসকমতেও বেদমধ্যে অপ্রমাণ বাক্য আছে, তাহা না থাকিলে “নির্দ্দোষতয়া” এ অংশটী সূত্রমধ্যে প্রবেশিত হইত না, “নিত্যতয়া” বলিলেই মীমাংসকগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। তার্কিকগণ কিছু জানেন না, মীমাংসকগণ কিছু জানেন না, এ কথা যদি কেহ বলিতে চাহেন, তবে তাহা অনভিজ্ঞতার ও ঔদ্ধত্যেরই পরিচায়ক। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, শাস্ত্রকারেরা অপ্রমাণ বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহা তো সম্ভবপর নহে? ইহার সমাধান তার্কিকগণ করিতে চাহেন না। স্কন্দপুরাণীয় বচনের নিকটই সমাধান জিজ্ঞাসা করা উচিত। তবে তার্কিকগণ কর্তৃক ইহার একটু মীমাংসা না হইতে পারে, এরূপ নহে। প্রয়োজন থাকিলে আহার্য্য জ্ঞানের জন্যও শাস্ত্রকারগণ অপ্রমাণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, ইহা বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। ইহার উপর আপত্তি হইতে পারে যে, অপ্রমাণ বাক্যপ্রয়োগের কি প্রয়োজন? ইহার উত্তর এই, বিধি-নিষেধ-কল্পনারূপ যে প্রয়োজন, তাহার উপযোগী বলিয়া আহার্য্য শাব্দবোধজনক অপ্রমাণ বাক্যও শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এবং স্তবরূপ অপ্রমাণ বাক্যও দেবতার সন্তোষ-সাধক বলিয়া শাস্ত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাধিতার্থক হইলেও স্তুতিবাক্য সন্তোষ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায়, যথা—“ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহঃ” ইত্যাদি।

অন্যান্য অর্থবাদাত্মক বাক্য দুর্ব্বল হইলেও তদ্দৃষ্টান্তে উপনিষদ্-

বাক্যের নিকৃষ্টতাবধারণ করা কি একান্ত ভ্রান্ত ব্যক্তির কার্য্য নহে, উপনিষদ্ মহাবাক্য বেদের শিরোভাগ, উহা যে হিন্দুমাত্রেরই অমূল্য নিধিস্বরূপ? অদ্বৈতবাদিগণের এই সব বাচালতা শ্রবণ করিয়া আর হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। বলি, উপনিষদ্‌কে নিকৃষ্ট কে বলে? উপনিষদ্‌বাক্য ভিন্ন যাবদ্‌বেদবাক্যই প্রায় স্বর্গাদি সাধন-কর্ম্মে অবিবেকি-ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিধি-বাক্যগুলি সাক্ষাৎ প্রবর্ত্তক, অর্থবাদপরম্পরায় অর্থাৎ বিধির উত্থাপক বিধায় প্রবর্ত্তক। পরম-বিবেকি-পুরুষের নিকট স্বর্গাদিরূপ ফল অতি-তুচ্ছ। তাঁহারা পরম প্রয়োজন নিঃশ্রেয়সেরই উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ব্রহ্মোপাসনাই কৈবল্যের একমাত্র উপায়। উপনিষদ্‌বাক্য সমুদয়ই প্রায় সেই ব্রহ্মোপসনাতাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সৎশাস্ত্রের প্রধানরূপে গণ্য, হইতে কোন আস্তিক ব্যক্তিরই বিবাদ নাই। তবে ঐ সকল মহাবাক্য সাক্ষাৎ বিধিবাক্য নহে, পরন্তু ব্রহ্মোপাসনা-বিধির উত্থাপক, তাহাতে ক্ষতি কি? উপনিষদ্ মহাবাক্য না থাকিলে ব্রহ্মোপাসনাটী যে আকাশ-কুসুম সমান হইত! উপনিষদ্-বাক্যের পরমুখনিরীক্ষকত্ব অর্থাৎ বিধির উত্থাপক হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞানাদিরূপ উপাসনা-প্রয়োজকত্ব, এবং প্রমাণান্তর-পরিশোধিত ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদকত্ব ও ব্রহ্মের স্তুতিবাদাত্মকত্ব ইহাই দৌর্ব্বল্য। গুরু প্রভৃতি মীমাংসকের মতেও বিধি-প্রত্যয়-শূন্য বাক্যের শাব্দবোধ-জনকত্ব না থাকিলেও যে কোন উপায় অবলম্বন দ্বারা সেই সেই বাক্যা-ধীন বিধিকল্পনা করিতেই হইবে। যে রাজা নিজ সামর্থ্য-বলে যুদ্ধে জয় লাভ করেন, তিনি তো অতিপ্রবলরূপে গণ্য আছেনই, যথা অর্জ্জুনাদি, এবং যে নরপতি সৈন্যাদি দ্বারা জয়লাভ করিয়া থাকেন, সে রাজাও অতি প্রবল, যথা ইদানীন্তন ভূপকুলতিলক ভারতেশ্বর।

দর্শিত বিচার দ্বারা ইহাই অবধারিত হইল, প্রায় উপনিষদ্‌বাক্য সমুদয়ই ব্রহ্মোপাসনা-তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তবে দুই পাঁচটী বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দ্দেশক আছে, ইহা দেখা যায়, সে বাক্য এই—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ," "সর্ব্বজ্ঞতা-তৃপ্তিরনাদি-বোধঃ," "তদবৈক্ষত", "স্ব-প্রপূর্ব্বমসৃজৎ" ইত্যাদি। নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন, ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের আশ্রয় এবং সেই কৃতি ও জ্ঞান নিত্য, ইহা দর্শিত মহাবাক্যের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে, নৈয়ায়িকগণ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতিবাক্যের ভাবনাপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, এবং কৃতি ও সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানকে নিত্য বলিলেন, আর অদ্বৈতবাদিগণ এই দুই চারিটী শ্রুতির নৈয়ায়িক মত-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান্তর করিতে পারিবেন না কেন? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বকর্তৃত্ব-সাধক তর্ক সহিত অনুমান আছে, এবং ব্রহ্মে সেই কৃতি ও জ্ঞান যে নিত্য, তাহারও বিশেষ যুক্তি আছে। অধিক কি, সূত্রের দ্বারাই নৈয়ায়িকগণের অভিমত ব্রহ্মতত্ত্ব স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। সূত্রের দ্বারা যে অর্থ প্রতিপাদিত হয়, তাহাই প্রকৃত অর্থ, ইহা সিদ্ধান্তবিৎ যাবদ্‌ব্যক্তির সম্মত। ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণের ব্যাস-সূত্র এই,—"অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা," "জন্মাদ্যস্য যতঃ," "অতএব জ্ঞঃ" ইত্যাদি। "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" এই প্রশ্ন-বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ," "অতএব জ্ঞঃ" এই সকল সমাধান-সূত্রের দ্বারা ব্রহ্ম যে কৃতি এবং জ্ঞানের আশ্রয়, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব তার্কিকগণ, "জগৎকর্ত্তৃত্ব," "সর্ব্বজ্ঞত্ব" রূপ যে ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহা কি এই সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল না? অদ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, ঐ সকল সূত্র ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দ্দেশক নহে, কিন্তু মায়া-

বিশিষ্ট ব্রহ্মের নির্দ্ধারক অর্থাৎ ঈশ্বর-বোধক। যে হেতু, ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মক। স্থতরাং তাহাতে কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞানাদিমত্ত্ব সম্ভব নহে। অদ্বৈতবাদিগণের এ ব্যবস্থাটী বড় হাসির কথা। ন হ্যন্যার্থপ্রশ্নে অন্যদুত্তরং সম্ভবতি। শিষ্যের জানিতে ইচ্ছা হইল যে, ব্রহ্ম কে? ইহার উত্তরে ঈশ্বর-তত্ত্বের নিরূপণ হইল। তবে অদ্বৈতবাদীরা বলিতে পারেন যে, মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই তো ঈশ্বর। অতএব ঐ সূত্রের দ্বারা ব্রহ্ম-নিরূপণ কি হইল না? এ বিষয়ের সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, "যৎ পুরীষং যঃ কৃমির্দস্যুরগম্যোপ-ভোক্তা" এই বাক্যটীও অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মসূত্র হইলেও হইতে পারে, তাঁহাদিগের মতে ব্রহ্ম উপাধ্যবচ্ছিন্ন হইয়া ঈশ্বর নাম ধারণ করিয়াছেন বলিয়া যদি ব্রহ্ম-নিরূপণ হয়, তবে বিষ্ঠা, কৃমি, দস্যু, অগম্যগামী প্রভৃতিও তো অদ্বৈতবাদিগণের মতে উপাধিধারী ব্রহ্ম। তদ্বোধক সূত্র করিলে দর্শিত জিজ্ঞাসার উত্তর-সূত্র না হইবার সম্ভব কি?

অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ব্রহ্মোপাসনা-বিষয়ক প্রবৃত্তিমৎপুরুষগণের প্রবৃত্তিকে দার্ঢ্য করিবার জন্য জগৎকর্ত্তৃত্বরূপ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিষ্ঠাত্ব-কৃমিত্বাদিরূপ যাবদপকৃষ্ট ধর্ম্ম ব্রহ্মগত হইলেও সে সকল ধর্ম্মগুলি ব্রহ্মোপাসনা-প্রবৃত্তি-দার্ঢ্যের উপযোগী হইতে পারে না, সুতরাং তার্কিকগণ কর্ত্তৃক সূত্রের যে আপত্তিটী উত্থাপিত হইয়াছে, সে আপত্তি আপত্তিই নহে। এ সম্বন্ধে তার্কিকগণের উক্তি এই, জন্ম-নিবৃত্তির জন্য যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানেচ্ছু হইয়া গুরু-সন্নিধানে উপনীত হইয়াছেন, সে সকল শিষ্যকে সর্ব্বভূতসৃষ্টিকারিত্বরূপ উৎকর্ষ প্রদর্শন করা হইতে পারে না। ঐরূপ ব্রহ্ম-প্রকর্ষ শ্রবণ করিলে বিবেকী ব্যক্তিগণের ঐ উপাসনায় উৎকট বিদ্বেষই জন্মে। তবে ব্রহ্মের ঐ উৎকর্ষ শ্রবণ করিলে পুত্রার্থীব্যক্তিগণের ঐ উপাসনায় উৎকট প্রবৃত্তি হইতে পারে। মনসা দেবী সর্পভয়নিবারিণী, ইহা শুনিলে সর্পভীরু

ব্যক্তিগণই মনসাদেবীর উপাসনায় উৎকট ইচ্ছুক হয়। কার্ত্তিক পুত্র দান করেন, এই উৎকর্ষ দেখাইলে পুত্রকাম ব্যক্তিগণই ঐ দেবতার উপাসনাতে বিশেষ প্রবৃত্তিমান্ হইয়া থাকেন। কিন্তু স্বর্গকাম ব্যক্তিরা কার্ত্তিক ও মনসার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় না।

এক্ষণে বক্তব্য এই, নৈয়ায়িকগণ অদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় বাক্‌সর্ব্বস্ব নহেন। তাঁহারা তর্ক জানেন, পদ-পদার্থের কিরূপ সম্বন্ধ ও তাৎপর্য্য লইয়া শাব্দবোধ করিতে হয়, তাহা জানেন, উপনিষদ্ জানেন, এবং শব্দ-মাত্রের উচ্চারণ শুনিয়াই ভীত হন না।

অঙ্গষট্‌করূপ ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধক চিন্তামণিদীধিতিকৃদ্‌ধৃত "সর্ব্বজ্ঞতা-তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ। অনন্তশক্তিশ্চ বিভো-র্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য॥" এই মহাবাক্যটীর একটু বিচার করা আবশ্যক। ঐ বাক্যমধ্যে "সর্ব্বজ্ঞতা," "অনাদিবোধ," "অলুপ্ত-শক্তি" এই তিনটী পদ রহিয়াছে। প্রথম পদ দ্বারা ব্রহ্ম সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানাশ্রয়, দ্বিতীয় পদটী দ্বারা সেই জ্ঞান অনাদি, তৃতীয় পদের দ্বারা শক্তি অর্থাৎ কৃতি; অলুপ্ত অর্থাৎ অবিনাশী, ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হই-তেছে। অদ্বৈতবাদীরা বলিতে পারেন, ঐ সকল গুণ বিশুদ্ধ ব্রহ্মের নহে, পরন্তু মহেশ্বর অর্থাৎ মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মের গুণ। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এ অর্থটী বড় মন্দ নহে, কিন্তু ঐ ব্যাখ্যায় ন্যাজা মুড়োটা বাদ দেওয়া হয়, কারণ, সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানে অনাদিত্ব, শক্তি অর্থাৎ কৃতিতে অলুপ্তত্ব, এ বিশেষণগুলি খাটিবে কেন? অদ্বৈতবাদিগণের মতে বিষয়াকার জ্ঞান মাত্রেই যে জন্য, এবং কৃতিমাত্রেই যে বিনাশী? ঐ বচনস্থ শক্তি শব্দের অর্থ কৃতি নহে, কিন্তু "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া" ইহা বলিলেও নিস্তার হয় কৈ? অদ্বৈতবাদীর মতে মায়া যে বিনাশী? তাহার হেতু, তন্মতে ব্রহ্ম ভিন্ন কোন ভাবই যে অবিনাশী নহে?

অদ্বৈতবাদিগণ যদি আশঙ্কা করেন যে, ব্রহ্মের অঙ্গঘট্‌ক-বোধক বচনটী মহাজন-প্রণীত নহে, পরন্তু কোন দ্বৈতবাদী কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া বহুকাল হইতে তার্কিক সম্প্রদায়েরই ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার উত্তর এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের আশঙ্কা ও বিচারপ্রণালী শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়াছি। বলি, বচন লইয়া যে আবার দলাদলি উপস্থিত! এরূপ বিচার করিলে অদ্বৈতবাদিগণ কোন্ উপনিষদ্ বা কোন্ ঋষিবাক্য প্রদর্শন করিয়া অদ্বৈত-মত রক্ষা করিতে পারিবেন, সকল প্রমাণ যে একেবারেই উড়িয়া যাইতে পারে। উপনিষদ্ কি ঋষিবাক্যের যে প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইবে, সে নিশ্চয়ের শিষ্টাচার-পরম্পরা-পরিগৃহীতত্বই একমাত্র সহায়; অতএব শিষ্টপরিগৃহীত বচনের মধ্যে কতকগুলি বাক্য প্রমাণ এবং কতকগুলি বাক্য অপ্রমাণ, এরূপ নিশ্চয় করিবার চেষ্টাটী কি কেঁচো ধরিবার চেষ্টায় গমন করিয়া ভুজগস্পর্শের তুল্য নহে? অতএব যে সকল বাক্য মহাজন-পরম্পরা-প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সে সকল বাক্যের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের বিভাগ করা তোমার আমার ক্ষমতা-সাধ্য নহে। তবে প্রচলিত সকল বাক্যের উপপত্তি-বিষয়ে যথাশক্তি সুধীগণের যত্ন করিতে হইবে।

ব্যাসদেবকৃত "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে যৎপদ থাকায়, যৎপদঘটিত বাক্যের বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রোতা পুরুষের যে পদার্থে যে বস্তুর নিশ্চয় থাকে, সেই পদার্থে সেই হেত্বভিমত বস্তুর নিশ্চয়-তাৎপর্য্যে যৎপদঘটিত বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এইরূপ না হইলে যৎপদ-ঘটিত বাক্য-প্রয়োগ হইতেই পারে না। মহানস প্রভৃতিতে শ্রোতা পুরুষের ধূম-নিশ্চয় থাকায় ধূমবিশিষ্ট মহানসাদি-তাৎপর্য্যে এবং পর্ব্বতে ধূম-ব্যাপক সংশয় থাকিলেও পর্ব্বতে ধূমরূপ হেতু নিশ্চয় থাকায় পর্ব্বতাদি-তাৎপর্য্যে ও "যো ধূমবান্" এই বাক্য-প্রয়োগ হইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের

চতুর্দ্দশ বর্ষ স্ত্রীমুখানবলোকন এবং তাবদ্‌বর্ষে অভোজন সংশয়বৎ পুরুষকে লক্ষণের ঐ অভাব বুঝাইবার জন্য, 'যশ্চতুর্দ্দশবর্ষমভোক্তা স্ত্রীমুখমদ্রষ্টা' এই বাক্য-প্রয়োগ হইতে পারে না। যৎপদঘটিত বাক্য-প্রয়োগের যে এইরূপ নিয়ম, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রটী কিরূপে প্রযুক্ত হইল, কারণ, শ্রোতৃপুরুষের সর্ব্বভূতকর্ত্তৃত্বাদিরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞান তো নাই? জিজ্ঞাসু পুরুষের সর্ব্বকর্ত্তৃত্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব-নিশ্চয় যদি থাকিত, তবে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই হইতে পারিত না? ইহার সমাধান এই—"ক্ষিত্যাদিভূতানি সকর্ত্তৃকানি কার্য্যত্বাৎ" এই প্রসিদ্ধ অনুমান দ্বারা সর্ব্বভূত-কর্ত্তৃত্ব-নিশ্চয় থাকায় ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু পুরুষের ব্রহ্মের অপরতত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই প্রশ্ন-বাক্যের তাৎপর্য্য-বিষয়, যেহেতু, ব্রহ্মগত সকল তত্ত্বই মোক্ষোপায়, ইহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা ভগবদ্‌গীতা—"যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।" ইত্যাদি। যৎপদঘটিত বাক্যপ্রয়োগ করিলে সেই বাক্যলব্ধ ব্যাপ্য বস্তুর ব্যাপক-বোধের জন্য "তৎ" এই পদঘটিত বাক্য-প্রয়োগ অথবা তদ্‌বাক্যের অধ্যাহার অবশ্যই করিতে হইবে। তাহা না করিলে যৎপদঘটিত বাক্যটী নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ শাব্দবোধের জনক হইবে না। অতএব "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই বাক্যের আকাঙ্ক্ষা-পূরণের জন্য "স ক্ষিত্যাদ্যুপাদানপ্রত্যক্ষাশ্রয়ঃ" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া ক্ষিত্যাদি-কর্ত্তৃত্বরূপ হেতুব্যাপক তদুপাদান-প্রত্যক্ষরূপ ব্রহ্মতত্ত্বান্তর বুঝাইয়া শ্রোতা পুরুষের জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তি করা আবশ্যক হইবে। উপাদান-প্রত্যক্ষ যে উপাদেয়-কর্ত্তৃত্বের ব্যাপক ধর্ম্ম ইহা সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। দর্শিত ব্রহ্মতত্ত্ব-দ্বয়-বোধক ব্যাসকৃত সূত্রদ্বারা 'আনন্দ-বোধ-স্বরূপত্ব' 'ব্রহ্মতত্ত্ব' নহে, ইহাও নিশ্চিত হইল। দর্শিত সমাধান দ্বারা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বান্তর-নিশ্চয়বৎ

পুরুষের পুনর্ব্বার অপর-ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসানুসারে 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" এই মহাবাক্যটী শাস্ত্রান্তরে প্রযুক্ত হইয়াছে। তদ্‌বাক্যলব্ধ সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ববিত্ত্বের ব্যাপকরূপে প্রসিদ্ধ মিথ্যা-জ্ঞানজন্যবাসনা মিথ্যাজ্ঞানবদন্যত্ব-রূপ সাধ্য-বোধের জন্য 'তৎ' এই পদঘটিত বাক্যান্তরের অধ্যাহার করিতে হইবে। সংক্ষেপে যৎপদঘটিত বাক্যের বিচার প্রদর্শিত হইল।

ব্যাসদেব-কৃত "কৃৎস্নপ্রসক্তি" এই সূত্রটী তর্কপর হওয়ায়, এবং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রটী অনুমানপর হওয়ায় ব্যাসকৃত ঐ সকল সূত্রাত্মক গ্রন্থ কথঞ্চিৎ তর্ক বা আন্বীক্ষিকী শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে। অধিকরণ-শাস্ত্র প্রায় ন্যায়াঙ্গ—দৃষ্টান্ত-তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হওয়ায় ন্যায় শব্দের দ্বারা ব্যবহৃত হইতে পারে। গৌতম সূত্রে অনুমানাঙ্গ সকল বিষয়ের বিস্তারে বিচার থাকায় গৌতমোক্ত দর্শন সর্ব্বদর্শনের প্রধানরূপে গণ্য, ইহা যাবদভিযুক্ত ব্যক্তিরই স্থির সিদ্ধান্ত। এক্ষণে নিবেদন এই, যাঁহারা অদ্বৈতবাদ চর্চ্চা করিবেন, তাঁহাদের এদিক্ ওদিক্ একটু মীমাংসা দেখিলে ভাল হয়। কেবল শব্দ শুনিলে কোনও বিষয়েরই নিশ্চয় হইতে পারে না।

এস্থলে অদ্বৈতবাদি কর্ত্তৃক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, তর্ক দ্বারা যে মীমাংসা প্রদর্শিত হইল, ইহা অভিজ্ঞগণ-সম্মত নহে, কারণ "তর্কা-প্রতিষ্ঠানাৎ" এই ব্যাস-সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, তর্কের প্রতিষ্ঠাই নাই, তাঁহার লিপি এই,—"নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষা-মাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি, উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথাহি কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভা-স্যমানা দৃশ্যন্তে, তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তস্ততোঽন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যমাশ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ।" ইহার

মর্ম্মার্থ এই যে, তর্ক কোনও নির্ণয়ের উপযোগী নহে, তাহার কারণ, এক ব্যক্তি এক তর্কের উদ্ভাবন করিলে, তাহা অপেক্ষা অধিক-বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার বিপরীত তর্কের উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন। আবার তদপেক্ষা অধিক ধীমান্ ব্যক্তি তাহার বিপরীত তর্কের উদ্ভাবন করিতে পারেন। অদ্বৈতবাদিগণের ঐ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, শঙ্করাচার্য্যের ঐ ব্যবস্থাটী বিশেষ অভিজ্ঞগণের শ্রদ্ধেয় নহে, কারণ, তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ ও ঋষিবচন-বিরুদ্ধ। নানাবিধ যথাশ্রুতার্থে সংশয় হইলে একতর নিশ্চয় করিবার জন্য, এবং বেদের নানার্থ সংশয়স্থলে সেই সকল বেদ-বাক্যের একার্থপরতা নিশ্চয় করিবার জন্য, সত্তর্কানুমানকে সহায় না করিলে আর কোনও উপায় নাই। ঐ তর্ক অভিজ্ঞপুরুষই উদ্ভাবন করিতে পারেন। তর্ক অবলম্বন না করিয়া কেবল ঈশ্বর ও যোগী ব্যক্তিরই বেদার্থ-নিরূপণ হইতে পারে। সত্তর্ক উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া শত সহস্র বেদ দেখাইয়া কাঁদিলেও বেদার্থ-নিরূপণ হয় না। বেদবাক্যে যে বেদত্ব আছে, তর্কানুমান না জানিলে তাহাই বা কিরূপে স্থির হইবে? দুই চারিজন বলিয়া থাকেন যে, সেই সেই বাক্য বেদ, সুতরাং প্রমাণ। এ কথার উত্তর এই যে,দুই চারিজন বলিলে তাহা বেদও হয় না, প্রমাণবাক্যও হয় না। তাহা হইলে, চার্ব্বাকাদি অনেকে বলিয়াছেন, বেদ মিথ্যা ও ঈশ্বর নাই, এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদবাক্যও অপ্রমাণ হইয়া উঠিত। অতএব দলবদ্ধ কতকগুলি লোকের বাক্যমাত্র দ্বারা কোনও ফলাফল হয় না।

কোনও কোনও আধুনিক অদ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন যে, তর্কের দ্বারা শাস্ত্রার্থ-নিরূপণ দূরের কথা, তর্ক-শাস্ত্রের অধ্যয়নেও পাপ জন্মায়। এ বিষয়ে ঋষিবচন এই—“অধীত্য গৌতমীং বিদ্যাং শার্গালীং যোনি-মাপ্ন য়াৎ।” এবং “অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতিকো বেদনিন্দকঃ]

তঃস্থবং ফলনিষ্পত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ ॥" ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের এই সকল বাক্য মাত্র অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। ঐ সকল বচনের মর্ম্মার্থজ্ঞান যদি তাঁহাদের থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল বচন নিজ মতের পোষক বলিয়া অবধারণ করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শাস্ত্রার্থে সংশয় হইলে একমাত্র তর্কের সাহায্যেই সেই সংশয় নিরাকরণ করিতে হইবে; ইহা মহর্ষিগণের অভিমত। ঋষিবচনগুলি পুনরায় উদ্ধৃত হইল, যথা—

আর্য্যং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণাভিসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥
তত্রোপনিষদঞ্চৈব পরিশেষঞ্চ পার্থিব।
মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীংপরাম্॥
দুর্ল্লভং পরমং জ্ঞানং তর্কেণানুব্যবস্থতি॥

ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা কি বোধ হইতেছে না যে, তর্কোদ্ভাবন ব্যতিরেকে প্রকৃত শাস্ত্রার্থ নির্ণয় হইতেই পারে না? সর্ব্বদর্শন খণ্ডন করিয়া প্রতিভা প্রদর্শন করিলেও গৌতমোক্ত তর্কশাস্ত্রকেই শ্রীহর্ষাদি মুক্তি-প্রয়োজক বলিয়া স্থির করিয়াছেন; তাঁহার উক্তি—

উদ্দেশপর্ব্বণ্যথ লক্ষণেঽপি
দ্বিধোদিতৈঃ ষোড়শভিঃ পদার্থৈঃ।
আন্বীক্ষিকীং যদ্দশনদ্বিমালীং
তাং মুক্তিকামাকলিতাং প্রতীমঃ॥

সকল পণ্ডিতেরই ঐ মীমাংসা। গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—

জগদেব দুঃখপঙ্কমগ্নমুদ্দিধীর্ষুর্ভগবানক্ষপাদ অন্বীক্ষিকীং প্রণিনায়।

উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—

সৎপক্ষপ্রসরঃ সতাং পরিমলপ্রোদ্বোধবদ্ধোৎসবো,
বিম্লানো ন বিমর্দ্দনেঽমৃতরসপ্রস্যন্দমাধ্বীকভূঃ।
ঈশস্যৈব নিবেশিতঃ পদযুগে ভৃঙ্গায়মানং ভ্রম-
চ্চেতো মে রময়ত্ববিঘ্নমনঘো ন্যায়প্রসূনাঞ্জলিঃ॥

বিজ্ঞানভিক্ষু-প্রমুখ প্রাচীন আচার্য্যগণ-ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচনে সৎশাস্ত্রের পর্য্যায়েও দেখা যায়ঃ—

কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ঃ সাঙ্খ্যন্তু কপিলেন বৈ॥

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, "অধীত্য গৌতমীং বিদ্যাং" এই বচনটী পূর্ব্বে প্রমাণরূপে গণ্য ছিল না। আধুনিক অদ্বৈতবাদীরা ঐ বচনটীকে প্রমাণরূপে গণ্য করিতেছেন। তাহার হেতুও আছে; অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র অতি দুরূহ; সেই তর্কের দ্বারা মীমাংসা করিয়া যদি অদ্বৈতবাদী হইতে হয়, তাহা হইলে কেহই অদ্বৈতবাদে উন্মত্ত হইতে পারেন না। ঐ বচন প্রমাণই হৌক্ বা অপ্রমাণই হৌক্, তাহাতে নৈয়ায়িকগণ ভীত হন না; তাঁহারা মীমাংসা জানেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যদি কেহ কুতর্ক করে অর্থাৎ বেদ-বিরোধী তর্ক করে, তাহা হইলে তাহার যে অসদ্গতি হয়, ইহা নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেন। হেতুবাদ দ্বারা বেদনিন্দা করিলে যে দোষ হয়, তাহা "অহমাসং পণ্ডিতকো—" এই বচনস্থ "পণ্ডিতকো" "হৈতিকো" "বেদ-নিন্দকঃ" এই সকল বিশেষণের দ্বারা তো স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। যদি তর্ক-শাস্ত্র পড়িলেই দোষ ঘটিত, তবে ঐ বচনে "হৈতিকো" "বেদ-নিন্দকঃ" প্রভৃতি বিশেষণ থাকিত না।

অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন যে, "যস্তর্কেণাভিসন্ধত্তে—" এই বচনস্থ তর্ক-পদার্থ গৌতমোক্ত তর্ক অর্থাৎ "ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ" নহে, ও তর্ক অন্যরূপ; এবং "দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীং পরাং" এই বচনস্থ আন্বীক্ষিকী তর্ক-শাস্ত্র নহে; তাহা আত্মবিদ্যাপর। ইহার উত্তর এই যে,—যদি অন্যরূপ তর্ক থাকে, তবে অদ্বৈতবাদিগণের তাহা দেখান উচিত। নৈয়ায়িকগণের ইহা ধ্রুব বিশ্বাস আছে যে, গৌতমোক্ত তর্ক ব্যতিরেকে ধর্ম্ম-নির্ণয়ই কি, আর উপনিষদাদির বাক্যের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ই কি, কোন পদার্থের নিশ্চয়ই হইতে পারে না। আন্বীক্ষিকী শব্দে আত্মবিদ্যাপর, ইহা কেমন করিয়া বুঝিব। কোষ রহিয়াছে, আন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতিস্তর্ক-বিদ্যার্থ-শাস্ত্রয়োঃ।" কোষের দ্বারা যে শব্দের যে অর্থ অবধারণ হইবে, তাহাই সেই শব্দের শক্তি-লভ্য অর্থ। নিজ অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির জন্য যদি কোন স্থানে তর্ক বা আন্বীক্ষিকী শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তবে সে তর্ক বা আন্বীক্ষিকী শব্দ লাক্ষণিক অথবা তাহাদেরই স্বকৃত পারিভাষিক। ফল কথা, বিপ্রতিপত্তি-স্থলে গৌতমোক্ত তর্ককে সহায় না করিলে গীর্ব্বাণগুরুও একতরের নিশ্চয় করিতে পারেন না। তর্ক-সাহায্য ব্যতিরেকে লৌকিকার্থ নিরূপণও হইতে পারে না, অর্থাৎ তর্ককে অবলম্বন না করিলে সংশয়-স্থলে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানও হইতে পারে না, কেন হয় না, তাহার পরিপাটী এবং "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ—" এই ব্যাস-সূত্রের প্রকৃত অর্থাৎ ন্যায়মতানুকূল ব্যাখ্যা "কাশীবাস" গ্রন্থের অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন প্রসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে, এজন্য এ স্থলে তাহা আর প্রদর্শিত হইল না।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরমাণুর জন্যতা-খণ্ডন, পরমাণুতে জগদুপাদানত্ব-প্রদর্শন ও ব্রহ্মে জগদুপাদনত্ব-নিরসন, শঙ্করাচার্য্য-প্রদর্শিত পরমাণু-খণ্ডন-যুক্তির অসারতা প্রদর্শন, ন্যায়-শাস্ত্রে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কথার বিস্তারে না থাকার হেতু প্রদর্শন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের দীপিকাকার বিদ্যারণ্য মুনি "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ——" এই অংশের দীপিকায় লিখিয়াছেন :—"মূলকারণাৎ পরব্রহ্মণ উৎপন্না আকাশ-কাল-দিশঃ পরমাণবশ্চ যদা ব্যবস্থিতাঃ, তদা তত আরভ্য উত্তরকালীনা সৃষ্টির্গৌতমাদ্যুক্তপ্রকারেণ ব্যবতিষ্ঠতাম্।" এখন বিদ্যারণ্য মুনির মত হইল যে, আকাশ, কাল, দিক্, পরমাণু এই চতুর্ব্বিধ পদার্থই জন্য। আর মহর্ষি গৌতম ও কণাদের মতে ঐ চতুর্ব্বিধ পদার্থই নিত্য। এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি? উক্ত দুই মীমাংসাই তো ঋষিকৃত, এ স্থলে কোন্ মত অশ্রদ্ধেয় বা কোন্ ঋষিকে ভ্রান্ত বলিব? কিন্তু বিচার করিয়া না দেখিলেও ঐ সকল পদার্থকে নিত্য বলিতে ইচ্ছা হয়। কারণ, মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য, পক্ষধর মিশ্র, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি গদাধর ভট্টাচার্য্যান্ত গ্রন্থকারগণ এবং ত্রিবেণীর সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন-প্রমুখ শত শত অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ পদার্থ-চতুষ্টয়ের নিত্যতাই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ঐ সকল ব্যক্তিকে ভ্রান্ত এবং পুরাতন শাস্ত্রানভিজ্ঞ বলিতে সাহস হয় না। উপনিষদাদিরূপ মহাবাক্যার্থের যথার্থ তাৎপর্য্যাবধারণে সামর্থ্যরহিত ব্যক্তিগণ আপাততঃ সেই সেই মহাবাক্যের অর্থান্তর অবধারণ করিতে পারেন, কিন্তু মহর্ষি গৌতম

কণাদ সকল মহাবাক্যার্থের যে প্রকৃত তাৎপর্য্যাবধারণ করিতে পারেন নাই, অথবা সেই মহাবাক্যগুলি অবগত ছিলেন না, কিংবা সেই মহাবাক্যলব্ধ অর্থকে উপেক্ষা করিয়া চার্ব্বাকাদির ন্যায় স্বতন্ত্রতাবলম্বন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে তার্কিকগণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। অতএব পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-সম্প্রদায় ও মহর্ষিদ্বয় যখন ঐ পরমাণ্বাদি চতুর্ব্বিধ পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন, তখন বেদের তাৎপর্য্যার্থ অবশ্য তাহাই হইবে।

অদ্বৈতবাদ-পক্ষপাতী কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অদ্বৈতবাদী বহু পণ্ডিত এবং শঙ্করাচার্য্য আকাশ, কাল, দিক্ এই ত্রিবিধ পদার্থের জন্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কি বেদার্থ-তাৎপর্য্যাবধারণ হয় নাই? ইহা কিছু সন্দেহের কথা বটে, এখন ঐ সংশয়-নিরাকরণের জন্য সূক্ষ্মভাবে শাস্ত্রতত্ত্ব-সমালোচনা করা আবশ্যক। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আকাশের নিত্যতা প্রতিপন্ন আছে। "অনাদিনিধনঃ কালঃ" "স চ কালঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি ভূরি প্রমাণ দ্বারা কালের নিত্যতাও নিশ্চিত হইয়াছে। সেই আকাশ ও কালের উপর ঈশ্বর-জন্যত্ব-বোধক শব্দ যখন প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, কর্ণ-বিবরাদি ও ক্ষণ-দণ্ড-মুহূর্ত্ত-ব্যবহারোপযোগী আকাশ-কালোপাধিরূপ বিশেষণের জন্যতা লইয়াই আকাশ ও কালে জন্যত্ব-বোধক শব্দ প্রযুক্ত। ইহা অদ্বৈতবাদিগণেরও স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা আকাশ ও কালের নিত্যত্ব-বোধক সমুদয় প্রমাণগুলি উন্মত্ত-প্রলাপ হইয়া উঠে। "সৃজস্যাত্মানমাত্মনা" "তদাত্মানং সৃজাম্যহং" "আত্মানমসৃজত" ইত্যাদি বহু প্রমাণগম্য সৃষ্টত্ব পদার্থটীকে আত্মা নিত্য হইলেও যেরূপ আত্মবিশেষণ শরীরাদিতে অন্বিত করিয়া প্রমাণগুলির প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইবে, আকাশ-কালাদিতেও ঈশ্বর-জন্যত্ব তদ্রূপ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের দীপিকায় বিদ্যারণ্য মুনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে পরমাণু প্রভৃতিরও জন্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহার লিপিটী পুনর্ব্বার উদ্ধৃত করিলাম। যথা,—"পরব্রহ্মণ উৎপন্না আকাশ-কাল-দিশঃ পরমাণবশ্চ যদা ব্যবস্থিতাঃ, তদা তত আরভ্য উত্তরকালীনা সৃষ্টির্গৌতমা-দ্যুক্তপ্রকারেণ ব্যবতিষ্ঠতাম্।" আকাশ কাল যে উৎপন্ন নহে, ইহা পূর্ব্বেই দেখাইলাম; এক্ষণে পরমাণু প্রভৃতি জন্য কি না? এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আকাশ ও কালের অবাধিতার্থ সমন্বয়ের জন্য যখন "উৎপন্ন" এই শব্দটীর "উৎপন্নধর্ম্মবান্" অর্থ করিতে হইল, তখন পরমাণু প্রভৃতি শব্দেতে প্রযুক্ত সেই এক "উৎপন্ন শব্দটীর "উৎপন্ন-ধর্ম্মবান" অর্থই করিতে হইবে। কারণ, "সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি" ইহা সকল দর্শনকারেরই সিদ্ধান্ত।

বিশেষণগত জন্যত্ব লইয়া যে দর্শিত বাক্যের প্রামাণ্য ব্যবস্থা করা হইল, তাহাতে অদ্বৈতবাদীর মধ্যে কাহারও অসন্তোষ হইবে না, ইহা আমার একান্ত বিশ্বাস। যেহেতু, একমাত্র ব্রহ্মে অবিদ্যারূপ উপাধির নানাত্ব লইয়া প্রায় সকল দ্বিবহুচনান্ত বাক্যেরই প্রামাণ্যোপপত্তি করা যাবদদ্বৈতবাদীরই পরম ব্রত।

কোন কোন তার্কিক বলেন, যে বাক্যে পরমাণু-শব্দ-সাকাঙ্ক্ষ উৎ-পন্ন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সে পরমাণু শব্দে দ্ব্যণুক বুঝিতে হইবে। "দ্বৌ অণূ যত্র" এই বিগ্রহ-বাক্যার্থ-বোধক বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পাদিত দ্ব্যণুক শব্দটী যেমন দ্ব্যণুকরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ "পরমোঽণু-র্যত্র" এই বাক্যার্থ-বোধক বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পাদিত পরমাণু শব্দ দ্বারা সেই দ্ব্যণুক অর্থই ঋষিদিগের অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। অতএব কর্ম্ম-ধারয়ার্থ-তাৎপর্য্যক পরমাণু পদার্থের নিত্যত্ব স্বীকার কাহারও মতে বিরুদ্ধ নহে।

কোন্ দ্রব্য জন্য, কোন্ দ্রব্যই বা নিত্য; তাহার নিরূপণ-সম্বন্ধে মহর্ষি গৌতম হইতে এ পর্য্যন্ত যাবৎ তার্কিক ব্যক্তির অভিপ্রেত যৎকিঞ্চিৎ যুক্তিও প্রদর্শন করিতেছি। অনেকোপাদান-সংযোগ না হইলে কোন দ্রব্যই উৎপন্ন হয় না। অতএব যে দ্রব্যের নানা উপাদান নাই, সে দ্রব্য জন্য নহে, নিত্য। পরমাণু প্রভৃতি দর্শিত চতুর্ব্বিধ পদার্থের অজন্যত্ব-নিশ্চায়ক তর্কও আছে। তর্ক এই—"পরমাণ্বাদি পদার্থ-চতুষ্টয়ং যদি জন্যদ্রব্যং স্যাৎ, তদা লোকতঃ শাস্ত্রতো বা নানাবয়বজন্যং স্যাৎ।" দৃষ্টান্ত দ্ব্যণুকাদি গিরি মহাবারিধি পর্য্যন্ত। * এই তর্কটী উপদর্শিত মহাবাক্যার্থের বিরুদ্ধ, এজন্য ইহা তর্কাভাস বলিয়া স্থির করিতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিলে তাহার উত্তর এই যে, উক্ত মহাবাক্যের যে তাৎপর্য্যার্থ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার সহিত তো কিছুমাত্র বিরোধ হয় নাই। তবে "উৎপন্ন" শব্দের শক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থে আদর করা হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি? বিধি-প্রত্যয়শূন্য বেদের শক্যার্থগুলি যদি প্রমাণান্তর-পরিশোধিতার্থের বিরুদ্ধ হয়, তবে অবশ্যই শক্যার্থ পরিত্যাগ করতঃ লক্ষ্যার্থবোধ লইয়াই সেই বেদের প্রামাণ্যোপপত্তি করিতে হইবে। বিধি প্রত্যয়শূন্য হইলেও বেদে লক্ষণা হইবে না ইহা ভ্রান্তোক্তি মাত্র। কারণ, "আয়ুর্ঘৃতং" "ঘৃতমমৃতং" ইত্যাদি শত শত বেদবাক্যস্থলে লক্ষ্যার্থ-স্বীকার সর্ব্বসম্মত। "কাশীবাস" গ্রন্থে এ বিষয়ের বিচার দ্রষ্টব্য। অধিক কি, সকল উপনিষদের সারভূত শ্রীমদ্ভগবদগীতার "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ——" এই অংশের "সাধর্ম্ম্য পদটীকে ইচ্ছা থাক্ বা অনিচ্ছাই থাক্, শঙ্করাচার্য্যের স্বমতপুষ্টির জন্য লাক্ষণিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে।

---

* এই তর্ক পিতৃদেব-রচিত সংস্কৃত অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদীর নিকট আর এক কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, ঘট, পট, মঠ, তন্তু, ইষ্টক, কুম্ভকার প্রভৃতির কার্য্য-কারণ-রূপে দর্শন-স্পর্শনাদি হয় বলিয়া এক ব্রহ্মকে ঐ সকল সাজিতে হইয়াছে, যেমন রজ্জু কদাচিৎ সর্প সাজিয়া থাকে, এবং এক সূর্য্য জলাদিমধ্যে নানা সাজিয়া থাকেন। এ সকল বেশ চিত্তহরণকারী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে বটে, কিন্তু পরমাণুকে কেহ কখন তো দেখিতে পায় না, তবে ব্রহ্মের অসংখ্য পরমাণু সাজিবার যে কি প্রয়োজন, তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমতঃই প্রত্যক্ষ বিষয় ত্র্যসরেণু প্রভৃতি কার্য্য-পরম্পরা সাজিলে কি চলিত না? বহুলোক "পরমাণু" "পরমাণু" শব্দ উচ্চারণ করে, সে ব্যবহার-রক্ষার্থ ব্রহ্মকে "পরমাণু" সাজিতে হইয়াছে, এ সমাধানেরও উপর একটু জিজ্ঞাসা আছে। সকল বালক "জুজুবুড়ী" ও "এই বৃক্ষে ভূত আছে" "এই পুকুরে যক্ষ আছে" এইরূপ শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া থাকে, এই জন্য কি ব্রহ্মের "জুজুবুড়ী" প্রভৃতিও সাজিতে হইবে? অতি সূক্ষ্ম উপাদান ব্যতিরেকে দ্রব্যের উৎপত্তি হয়ই না, এই জন্য নৈয়ায়িকের নিত্য পরমাণু মানিবার আবশ্যকতা আছে।

পদার্থতত্ত্ব-তর্কাম্বুধি-পারগামী মহর্ষি প্রভৃতি অসংখ্য মহাজন যে আকাশ, কাল, দিক্, পরমাণুকে নিত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, অদ্বৈতবাদিগণ, দুই একজনের অস্ফুট লিখন দেখিবামাত্রই সেই চতুর্ব্বিধ পদার্থের জন্যতাবধারণরূপ অমূল্যরত্ন-মালা হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। বিদ্যারণ্য মুনির দীপিকা দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্দিহান হইয়াছি। তৈত্তিরীয় উপনিষদের "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ—" এই অংশের দীপিকা হইল, "উৎপন্না আকাশ-কাল-দিশঃ পরমাণবশ্চ যদা ব্যবস্থিতাঃ" ইত্যাদি। বহু প্রমাণ দ্বারা কাল দিক্ পরমাণুর নিত্যত্বই সিদ্ধ আছে, তৈত্তিরীয়ের ঐ অংশেও কালাদির নাম-গন্ধ নাই, অথচ বিদ্যারণ্য

মুনি দীপিকায় সেই কাল দিক্ পরমাণু প্রভৃতিকে উৎপন্ন বলিয়া গাহি-
লেন, শুধু গান নহে, তালও দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ গোতমাদির সৃষ্টি-
প্রণালী কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, ইহাও বুঝাইয়াছেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা
করি, যিনি যাহা লিখিবেন, তাহাই গ্রাহ্য, আর গোতম-কণাদের বাক্যই
অগ্রাহ্য, মহর্ষি গোতম-কণাদ কি সকল অপেক্ষাই অনভিজ্ঞ ছিলেন?

বিদ্যারণ্য-মুনিকৃত দীপিকায় "উৎপন্না আকাশ-কাল-দিশঃ পরমাণবশ্চ" এই অংশটুকু দেখিয়া শব্দ-সর্ব্বস্ব অদ্বৈতবাদিগণ আকাশাদি পদার্থ-চতুষ্টয়কে উৎপন্ন বলিয়া মানুন, কিন্তু ঐ আকাশাদির যে বিনাশ হয়, এ সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট লিপি তো দেখেন নাই। অতএব আকাশ-কালাদি পদার্থ-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি আছে, বিনাশ নাই, ইহাই কি তাঁহাদিগের ধারণা?

তর্কদ্বেষী অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন, "যিনি যিনি উৎপন্ন ভাব, তিনিই বিনাশী—" এই ব্যাপ্তি বশতঃই বিনাশের অনুমান হইবে। ইহার উত্তর এই যে, অদ্বৈতবাদিগণ এ মত অবলম্বন করিয়া বিনাশের অনুমান করি-বেন কেন? এ যে ন্যায় মত!! বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদীরা অনুমান করিতে পারেনই বা কৈ, ইহাতে যে উপাধি রহিয়াছে!!! উপাধি, "দ্বয়ানুপাদানক-দ্রব্যভিন্নত্ব।" * এইরূপ নানাবিধ কৌশল নৈয়ায়িকের মস্তিষ্কে বিরা-জিত থাকায় তাঁহারা অদ্বৈতবাদিগণের নিকট এত বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া-ছেন। এ বিচারাংশ যাঁহারা বুঝিবেন, তাঁহাদের প্রতিও সন্তোষ, যাঁহারা না বুঝিবেন, তাঁহাদের প্রতিও অসন্তোষ নাই। অদ্বৈতবাদীরা আর এক কথা বলেন যে, পরমাণ্বাদির লয়-স্বীকার না করিলে অদ্বৈত-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। উঃ! এ কথা শুনিয়া নৈয়ায়িকগণের হৃদয় যে কাঁপিয়া উঠিল।

---

* এই উপাধি পিতৃদেব-রচিত সংস্কৃত অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" ইত্যাদি এবং "এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।" এই সকল মহাবাক্যের যথাশ্রুত অর্থ বুঝিয়া নৈয়ায়িকগণ এই স্থির করিয়াছেন যে, পার্থিব পরমাণ্বাদির ঈশ্বরের সহিত ও পরস্পরের পারমার্থিক ভেদ আছে, কেবল উপাধিকৃত নহে। তাহা হইলে "অষ্টধা" এই অংশ দিলেই চলিত, "ভিন্না" এ অংশ দিতে হইত না। অতএব ধর্ম্মী এবং ধর্ম্ম উভয়েরই ভেদসিদ্ধি করিবার জন্য "ভিন্না" ও "অষ্টধা" এই দুইটী পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। নৈয়ায়িকগণ—,"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ" এবং "এতদ্যোনীনি ভূতানি" এই উভয় বচনের যথাশ্রুতার্থ অবগত হইয়া ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, জন্য ভূতমাত্রেরই পার্থিবাদি পরমাণু উপাদান-কারণ। অপর সকল নিমিত্ত-কারণ। পরমেশ্বর ঐ পার্থিবাদি পরমাণুকে উপাদানরূপে গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং কোনও ভূতকেই সৃষ্টি করেন না। এ বিষয়ে গীতায় ভগবদ্বাক্য এই, "প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।" (অবষ্টভ্য সহায়ীকৃত্য)। পূর্ব্বকথিত পার্থিবাদি পরমাণু-সন্ততি প্রসব-কর্ত্রী অর্থাৎ উপাদান-কারণ, এবং ব্রহ্ম সেই উপাদান-প্রত্যক্ষের আশ্রয় বলিয়া কর্ত্তৃবিধায় কারণ, ইহাও গীতা দ্বারা বুঝা যাইতেছে। গীতা যথা, "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" কর্ত্তৃবিধায় ও উপাদানবিধায় বিভিন্ন পদার্থে যে কারণত্ব আছে, তাহা "ময়াধ্যক্ষেণ" "প্রকৃতিঃ" এই দুই অংশের দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। যদি কেবল ব্রহ্মই উপাদান-বিধায় ও কর্ত্তৃবিধায় কারণ হইতেন, তাহা হইলে "প্রকৃতিঃ সূয়তে" না থাকিয়া "অহং সূয়ে" এইরূপই থাকিত।

এখন সেই উপাদানীভূত পার্থিবাদি পরমাণুকে জন্য বলিতে হইলে তাহাদের প্রতিও আবার ঐ পার্থিবাদি পরমাণু উপাদান-কারণ হইয়া

উঠে। তাহা স্বীকার করিলে অনবস্থা-দোষ ঘটিয়া যায়। যে কারণে যে কার্য্যের লয় হয় অর্থাৎ ধ্বংস হয়, সেই কারণই সেই কার্য্যের উপাদান-কারণ, ইহা সর্ব্বসিদ্ধান্ত। গীতায় ভগবান্‌ও স্পষ্টভাবে তাহা প্রদর্শন করিয়া-ছেন, যথা—"এতদ্‌যোনীনি ভূতানি" ইহা দ্বারা পরমাণুর কারণত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং "প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্" এই অংশের দ্বারা পর-মাণুতে লয় হয়, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন জগৎকর্ত্তৃ ব্রহ্ম যদি উপাদান হইতেন, তাহা হইলে "মামিকাং যান্তি" না থাকিয়া "মাং যান্তি" থাকিত। ঐ গীতার মর্ম্মার্থ যাহা প্রদর্শন করা হইল, তাহার যে বিপরীত অর্থ হয় না, এ কথা বলিতে চাহি না, কারণ, কোনও নিপুণতর ব্যক্তি "কথমেতৎ কুচ-দ্বন্দ্বং পতিতং তব সুন্দরি" এই কালিদাসকৃত আদিরস-শ্লোকটীর শক্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, পার্থিবাদি পরমাণু নিত্য। পরমাণুর নিত্যতা-সম্বন্ধে লাঘবরূপ যুক্তিও আছে। সেই লাঘব এই,—পর-মাণ্বাদির জন্যতা স্বীকার করিতে হইলে সেই পরমাণুর প্রাগভাব ও ধ্বংস, আবার সেই ধ্বংসের প্রাগভাব, আবার তাহার ধ্বংস, এইরূপে অনন্ত অভাব-পদার্থ স্বীকার করিতে হয়। নিত্য বলিলে আর এত অভাব-পদার্থ স্বীকার করিতে হয় না।

শঙ্করাচার্য্য-মতাবলম্বী কেহ কেহ বলিতে পারেন, পরমাণু লইয়া বহু আড়ম্বরে যে বিচার করা হইল, তাহা কি "শিরো নাস্তি শিরোরোগঃ" ইহার সমান নহে? শঙ্করাচার্য্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া পরমাণুর তো খণ্ডনই করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির মর্ম্ম এই, যে যে অবয়ব হইতে যে যে অবয়বী উন্নতিলাভ করিয়া থাকে, সেই সেই অবয়বের একদেশ সংযোগই সেই সেই অবয়বীর উন্নতি-সাধক, ইহাই সর্ব্বস্থলে দেখা যায়। যথা, কপাল-কপালিকার আংশিক সংযোগ হওয়াতেই এবং বহু সূক্ষ্ম তন্তুতে ঐরূপ

একদেশ-সংযোগ হওয়াতেই ঘট ও বস্ত্রাদি উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। অতি সূক্ষ্ম নিরবয়ব পরমাণু-সংযোগের সাহায্যে কোন দ্রব্যই উন্নতিলাভে সমর্থ হইতে পারে না, কারণ, পরমাণুর অংশ অর্থাৎ অবয়ব নাই। অতএব পরমাণু আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক, তাহা স্বীকারের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই।

উঃ! অদ্বৈতবাদিগণের কি অকাট্য আশঙ্কা! পরমাণু-খণ্ডন-বিষয়ে ঐ যুক্তিটী আপাততঃ রমণীয় বটে, কিন্তু তাহা আস্তিকগণের অশ্রদ্ধেয়। তাহার কারণ এই, যে যুক্তি ভগবদ্‌বাক্য, বেদবাক্য,ও ঋষিবাক্যের বিরুদ্ধ, সে যুক্তি আস্তিক দূরদর্শিগণের কর্ণেও স্থান পায় না। ভগবদ্‌বাক্য যথা, "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত" এবং "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ—" ইত্যাদি। এই বাক্যদ্বয় দ্বারা প্রলয়কালে অতীন্দ্রিয় ভূতচতুষ্টয় থাকে, ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়ায় পরমাণুর পারমার্থিকতা কি সিদ্ধ হইল না? "স য এষ অণিমা" এই উপনিষদংশের দ্বারা কি বুঝা যাইতেছে? মহর্ষি বিদ্যারণ্য, মহর্ষি গৌতম ও মহর্ষি কণাদের লিখন কি পরমাণু-খণ্ডন-কর্ত্তা দেখেন নাই? এবং "এতদ্‌যোনীনি ভূতানি" এই ভগবদ্‌বাক্য দ্বারা উপক্রান্ত অতীন্দ্রিয় ভূতচতুষ্টয় হইতে যে ভূত চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয়, তাহা কি সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে না? "স য এষ অণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" এই ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌বাক্য দ্বারা অণু হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি, ইহা কি বুঝা যাইতেছে না? বিশেষ বিচার অর্থাৎ পরমাণু-সাধক অনুমানও আছে, তাহা কাশীবাস গ্রন্থের অদ্বৈতবাদখণ্ডনভাগে দ্রষ্টব্য।

খণ্ডনকারের ব্যাপার দেখিয়া তার্কিকগণ অবাক্ হইয়াছেন। তিনি পরমাণুকে তো রসাতলে দিলেন, এখন ছান্দোগ্য উপনিষদেরও দেখি সেই দশা! উপনিষদে স্পষ্ট রহিয়াছে, "স য এষ অণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" অর্থাৎ যাহাতে সকল শেষ লয় হয়, সেই অণু হইতে এই জগৎ সৃষ্ট।

যদি বলেন, ব্রহ্মই অণিমা সাজিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন; তাহার উত্তর এই, অণিমা হইতে সৃষ্টি হইল কিরূপে, অণিমারও তো আংশিক সংযোগ নাই ?

এক্ষণে বুঝা গেল, পার্থিবাদিভেদে পরমাণু যে চারি প্রকার ও সেই চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতেই যে চতুর্ব্বিধ ভূতোৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা মহর্ষি গৌতম-কণাদ-সম্মত তো বটেই, অধিকন্তু বিদ্যারণ্য মুনি, উপনিষদ্-প্রণেতা ও ভগবান্ বাসুদেব মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। ঐ মহর্ষি গৌতম কণাদ প্রভৃতি যে অভ্রান্ত ও অপ্রতারক, ইহা নৈয়ায়িকগণের দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব দুই একটা লৌকিক যুক্তি (অর্থাৎ যেরূপ সংযোগ হইলে কার্য্য দ্রব্যের উৎপত্তি দেখা যায়, পরমাণুদ্বয়ের সেরূপ সংযোগ জন্মাইবার সম্ভব নাই। তবে কি অনুরোধে পরমাণু মানিতে হইবে ? ইহা) দেখাইয়া আনন্দে বগল বাজান ও তাল-ঠোকা কি চাপল্যের ফল নহে ? ঐ যুক্তি শুনিয়া দর্শিত অভ্রান্ত মহাপুরুষগণের বাক্যগুলিকে কি অপ্রমাণ বুঝিব ? তাহা হইলে জগৎ যে উচ্ছন্ন যাইবে ? বেদবাক্য ও মহর্ষিবাক্য শুনিয়া আয়াস-সাধ্য বৈধকার্য্যে কে আর প্রবৃত্ত হইবে ? অতএব যে অবয়বের যে জাতীয় সংযোগ লৌকিক কার্য্যোৎপত্তির প্রয়োজক হইয়া থাকে, পরমাণুদ্বয়ে দ্ব্যণুকোৎপাদক সেই জাতীয় সংযোগ জন্মে, ইহাই কল্পনা করিতে হইবে। সে সংযোগ দিগ্‌বিশেষাবচ্ছেদে সংযোগ, তাহা পরমাণুতে অসম্ভব নহে। ঐরূপ সংযোগ হইতেই কার্য্যোৎপত্তি হয়, ইহাই মহর্ষিগণের অভিমত। লৌকিক দুই পাঁচটা স্থল দেখাইয়া অলৌকিক সম্বন্ধে কোন কথাই হইতে পারে না। বিবর দ্বারা জল না যাইলে কোন জলাধারে জল থাকা দেখা যায় না, কলসের বিবর আছে এবং বোতল প্রভৃতির বিবর আছে, এজন্যই ঐ সকল বস্তু জলপূর্ণ থাকিতে পারে। নারিকেলে ছিদ্র নাই, সুতরাং ইহার মধ্যে জল থাকা নিতান্ত অসম্ভব। এইরূপ বদতাম্বর ব্যক্তি কর্ত্তৃকই

পরমাণু-খণ্ডনের যুক্তিটী উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহাই তার্কিকগণের সিদ্ধান্ত।

পরমাণু-খণ্ডন দেখিয়া অদ্বৈতবাদীরা খণ্ডনকর্ত্তার মনোগত ভাব কি বুঝিলেন? তাঁহারা কি বুঝিলেন না যে, শত শত ঋষিবচন, উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা থাকিতেও সে সকল বচনকে ভ্রান্ত পুরুষোক্তির ন্যায় তুচ্ছ করিয়া নিজের যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া ঐ খণ্ডয়িতা পরমাণু পদার্থটীর অস্তিত্ব লোপ করিয়াছেন? ইহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল, যুক্তি-বিরুদ্ধ হইলে ঐ খণ্ডন-কর্ত্তার মতে শত শত মহাবাক্যও পদার্থ-সাধক হইতে পারে না। এ স্থলে বক্তব্য এই, খণ্ডনকর্ত্তা শব্দ মাত্র শুনিয়া প্রকৃতার্থ না বুঝিয়া যুক্তি-বিরুদ্ধ তর্ক-বিরুদ্ধ ব্রহ্মকে জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ কিরূপে বলিলেন, তাহা নৈয়ায়িকগণ বুঝিতে অক্ষম। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতির প্রকৃতার্থ "কাশীবাস" গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

উপনিষদ্-সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদিগণের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়াছি। তাঁহাদের ছান্দোগ্য উপনিষদ্-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা :—শ্বেত-কেতু মহর্ষির বেদপাঠ, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত সম্পন্ন হইলে, ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার বিবেচনায় কৈবল্যোপায় ব্রহ্মজ্ঞান করাইবার জন্য শ্বেতকেতুর পিতা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি "তৎসত্যং স আত্মা" ইত্যন্ত বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত পূর্ব্বক পারমার্থিক ও ব্যবহারিক যাবৎ পদার্থতত্ত্ব বুঝাইয়া-ছেন। অবসানে "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই বাক্য দ্বারা মুক্তিরূপ পরম-ফল অবগত করাইয়াছেন। যেহেতু, জীবেতে পরব্রহ্মের অভেদই মুক্তি-পদার্থ। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ উপাসনোপদিদিক্ষু শ্বেতকেতু পিতার পদার্থ-নিরূপণের কি আবশ্যক? ইহার উত্তর, জন্য-জনকত্বাদিরূপে জ্ঞান এবং পারমার্থিক ও ব্যবহারিক যাবৎ পদার্থে ব্রহ্মা-ভেদজ্ঞানই মোক্ষোপায়। ঐ জ্ঞান আহার্য্য নহে, কিন্তু প্রকৃততত্ত্বজ্ঞান, ইহা

বুঝাইবার জন্য প্রকৃত পদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণের ইহাই নিয়ম, তাহা না হইলে গৌতম-কণাদ কর্ত্তৃক পদার্থ-নিরূপণ কি জন্য হইয়াছে? অদ্বৈতবাদিগণের উপনিষদ্-বাক্যের ঐরূপ তাৎপর্য্যোপবর্ণন সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয় না। কারণ, "তত্ত্বমসি" ইহা জীবাবস্থায় জ্ঞান-তাৎপর্য্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে, মুক্তিরূপ পরম-ফল-তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত নহে। মুক্তিরূপ ফল-তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইলে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের সমানার্থক ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা এই ভগবদ্গীতার বিরুদ্ধ হয়। ভগবদ্গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" এই অংশের অনেক পরে ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তি-লাভের কথা লিখিত হইয়াছে। গীতা যথাঃ—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানন্তি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

এই মহাবাক্য দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহা অভিজ্ঞলোকেই বুঝিতে সক্ষম। যাঁহারা মধ্যে মধ্যে দুই পাঁচটী উপনিষদ্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া থাকেন, নিশ্চয়ই বলিতে পারি, সে সকল ব্যক্তি জন্ম-সহস্রেও "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই উপনিষদংশের ভাবার্থ এবং "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" এই ভগবদ্বাক্যের ভাবার্থ বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। ভগবদ্বাক্যে "ব্রহ্মভূত" এই বাক্যটী যে সময় প্রযুক্ত হইল, তখন "তত্ত্বত" এ পদটীর নাম-গন্ধ থাকিল না, অনেক পরে লিখিত "যাবান্ যশ্চাস্মি" এই সময়ে "তত্ত্বতঃ" এই পদটী প্রযুক্ত হইল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যাহার যৎকিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি আছে, সে ব্যক্তিও অবশ্য বুঝিতে পারিবে, "তত্ত্বমসি" "ব্রহ্মভূত" ইত্যাদি বাক্য আহার্য্যজ্ঞানপর, ব্রহ্মতত্ত্বপর নহে, এবং কৈবল্যরূপ পরম-প্রয়োজনপর নহে। কাশীবাস গ্রন্থে সুস্পষ্ট করিয়া

ঐ সকল মহাবাক্যের প্রকৃতার্থ বুঝাইবার কিছুমাত্র ত্রুটি করা হয় নাই। এক্ষণে যতদূর সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতেছি, ইহা-তেও যদি না বুঝেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না। "তদজ্ঞানং দোষঃ পুরুষস্য"। "তত্ত্বমসি" "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" এই দুইটী মহাবাক্যের একই অর্থ, তবে কিরূপে মুক্তিতাৎপর্য্যে অথবা ব্রহ্মের পার-মার্থিক জ্ঞানতাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইবে? ঐ ভগবদ্গীতার অপরাংশ দ্বারা ব্রহ্মাভেদজ্ঞানের পর পরা ভক্তি লাভ হয়, সেই পরমভক্তিবলে সর্ব্ব-কর্তৃত্বাদিরূপ ব্রহ্মগত যাবদ্ধর্ম্ম-প্রকারে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানই তত্ত্বতো ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা কি স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে না? অতএব ভগবদ্গীতার যাহারা প্রকৃত ভাবার্থ এবং বিচার করিয়া "তত্ত্বমসি" "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" এই বাক্যদ্বয়ের একই অর্থ বুঝিয়াছে, তাহারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবাদীর দলে কেমন করিয়া মিলিবে? ঐ সকল লোকের যে বুদ্ধি আছে, ব্যুৎপত্তি আছে, মীমাংসা-জ্ঞান আছে। অদ্বৈতবাদীর আর একটী আব্দার এই,— 'বাক্যানাং যথাশ্রুতার্থস্বাদায়োপপত্তিসম্ভবে তৎপরিত্যাগস্যান্যায্যত্বাৎ' তত্ত্ব-মসি এই বাক্যটীর পারমার্থিক জীব-পরমব্রহ্মাভেদপরত্ব আবশ্যক। এ আব্দারটী অন্ধব্যক্তির সমান, তাহার কারণ, "তত্ত্বমসি" এই বাক্য অপেক্ষায় "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" এই বাক্য দ্বারা জীব ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছেন। ইহাই অধিকতর সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে বলিয়া কি তাহাই অবধারণ করিতে হইবে? অতএব বাধক থাকিলে যথাশ্রুতার্থ-পরিত্যাগ মীমাংসা-বিরুদ্ধ নহে। সুতরাং "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই উভয় বাক্যের একবাক্যতা করা মীমাংসাভিজ্ঞমাত্রেরই সম্মত, তাহার কারণ "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যতে" এবং অর্থবাদের শক্যার্থ-পরত্ব অতি দুর্ব্বল ও অতি বিরল। পরন্তু বিধি-নিষেধ-কল্পকত্ব অধিকতর বল, ইহা এই গ্রন্থেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

"জপা কর তপা কর ভবী ভোল্‌বার নয়।" হাজার বুঝাও, শাস্ত্রার্থের সূক্ষ্ম মীমাংসা হাজার প্রদর্শন কর, অদ্বৈতবাদী ভুলিবার ছেলে নয়! এক-ঘেয়ে ভ্রামক শ্রুতিসাগরে পড়িয়া অদ্বৈতবাদিগণের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যতই বুঝাও, সংশয় আর যায় না! কাশীবাস গ্রন্থে বহু-জাতীয় শ্রুতির সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, জগতে যত শ্রুতিই বাহির করিবে, এই প্রণালীতে সকলেরই মীমাংসা করিয়া লইবে। কিন্তু বলিলে কি হয়, তাহা মাথায় প্রবেশই করে না, "গাণ্ডে পিণ্ডে গিলিয়ে দিলেও তবু খাই খাই", এখনও শ্রুতির ন্যায়-সম্মত ব্যাখ্যা-বিষয়ে অদ্বৈত-বাদিগণের ঘোর সন্দেহ! তাঁহাদের চরম আপত্তি এই, নৈয়ায়িকগণ যতই বুঝান, একটী শ্রুতিতে স্পষ্ট দেখিলাম, "দ্বৈতমিব ভবতি" রহিয়াছে। শ্রুতি যথা, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি যত্র তস্য সর্ব্বথা-ত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ॥" ভাবার্থ এই—ব্রহ্ম অবিদ্যারূপ উপাধি-বশে সংসার-অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হন, অর্থাৎ জীবভাবাপন্ন থাকেন, তখন পার্থক্যরূপেই বিষয়াদির প্রত্যক্ষ করেন। তত্ত্বজ্ঞানাধীন সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ মুক্তি হইলে আর পরস্পরের দেখা-শুনা হয় না। অদ্বৈতবাদিগণ কি তাল-কাণা! কোন্ দিকে "ভবতি" পদটী আছে, কোন্ দিকেই বা "অভূৎ" পদটী আছে, তাহা কি অদ্বৈতবাদিগণ কম্ করনে নাই? এ যে সৃষ্টি-প্রকরণীয় উপনিষদ্, ইহা মুক্তি-প্রকরণীয় নহে! মুক্তিপ্রকরণীয় হইলে "অভূৎ"না থাকিয়া "ভবিষ্যতি" থাকিত। উপনিষদ্-সার ভগবদ্গীতাতে "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" প্রভৃতি ভেদসাধক স্পষ্ট বাক্যের দ্বারা "সাম্যমুপৈতি" প্রভৃতি মহাবাক্যদ্বারা এবং ব্রহ্মসূত্রোক্ত তর্কের দ্বারা ব্রহ্ম, জীব ও ঘটাদির পরস্পর পারমার্থিক পার্থক্যই আছে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে; এবং ঋষিগণের উপনিষদ্ অধ্যয়নের পর যখন তর্ক অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তখন সুধীগণের ইহাই বিবেচনা করিতে

হইবে, কেবল উপনিষদ্ শব্দ শ্রবণমাত্রেই কোন অর্থের অবধারণ করা সম্ভবপর নহে। এখনকার সুধীগণ উপনিষদের সর্ব্বাংশ দেখিতেছেন, ঋষিগণ তাহা দেখেন নাই, ইহা আমরা বলিতে সাহস করি না। এরূপ স্থলে যাবৎ শ্রুতির ব্যাখ্যা প্রদর্শন করা নিতান্তই অনাবশ্যক। তবে অদ্বৈতবাদীর আন্ধার-নিবৃত্তির জন্য "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি—" এই শ্রুতিটীরও কিছু ভাবার্থ প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

উপনিষদ্স্থিত "যত্র" এই পদদ্বয়ের "যদা" অর্থাৎ "যস্মিন্ কালে" এই অর্থ সর্ব্বসম্মত। পূর্ব্বপ্রযুক্ত যৎপদঘটিত বাক্যস্থলে ঐ বাক্যের আকাঙ্ক্ষা-পূরণের জন্য পরে "তৎ" এই পদঘটিত বাক্য প্রয়োগের আবশ্যকতা থাকায় ঐ স্থলে "তৎ" পদঘটিত বাক্য-প্রয়োগ না করিলে যৎপদঘটিত বাক্যটী নিরাকাঙ্ক্ষ বিধায় শাব্দ-বোধের জনকই হইতে পারে না! ইহার দৃষ্টান্ত, "যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্" এইরূপ বাক্য-প্রয়োগ করিলেই শাব্দবোধ জন্মিয়া থাকে। "যো ধূমবান্ বহ্নিমান্" এই বাক্যদ্বয় লইয়া শাব্দবোধ কাহারও সম্মত নহে।* এজন্য উক্ত মহাবাক্যস্থ অব্যয় "তৎ" পদদ্বয়ের অগত্যা "তদা" এই অর্থই করিতে হইবে। উক্ত বাক্যস্থ "তৎ" পদদ্বয় ব্রহ্মতাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা কেহ বলিতে চাহেন, তাঁহার ভ্রান্তোক্তি। কারণ, সেরূপ অর্থ করিলে "যৎ" পদঘটিত বাক্যটী নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া উঠে, ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইল।

এক্ষণে ঐ "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" এই শ্রুতিটীর ভাবার্থ প্রকাশিত হইতেছে। "যত্র তু সর্ব্বথৈবাত্মাভূৎ" অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ব্রহ্ম শরীরধারী ছিলেন না, সুতরাং সে সময় অপর শরীরধারীও কেহ ছিল না, অতএব কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কে কাহাকে দেখিবেক? যখন "দ্বৈতমিব

* প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা গদাধর ভট্টাচার্য্য শক্তিবাদ গ্রন্থে য় শব্দবিচারস্থলে এইরূপ নিয়ম প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভবতি” অর্থাৎ ব্রহ্ম এক হইলেও শরীর ধারণ করিয়া ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদিরূপে দ্বৈতবৎ প্রকাশ পাইলেন ও সেই সময় হইতে মানবাদি সৃষ্টি আরম্ভ হইল, সুতরাং পরস্পরের দেখা-শুনা চলিতে লাগিল। ব্রহ্মই যে ঐ সকল অপ্রাকৃত শরীর ধারণ করেন, তাহার প্রমাণ "উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" "সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্।" এবং "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" ইত্যাদি। মানবাদি যাবৎ শরীর যদি ব্রহ্মের হইত, তাহা হইলে দর্শিত কার্য্যবিশেষের জন্য ব্রহ্মের শরীরধারণের কথা লিখিত হইত না।

"অস্য" অর্থাৎ ব্রহ্মের চিরাবস্থাই "সর্ব্বথা" অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্ববিষয়ক কৃতিমত্ত্ব, সর্ব্ববিষয়ক ইচ্ছাবত্ত্বস্বরূপ সকল ধর্ম্মপ্রকারে অবস্থিত হইয়া "আত্মৈবাভূৎ" অর্থাৎ অচিরস্থায়ী শরীরিত্বরূপ ধর্ম্ম যখন পরিত্যাগ করেন। "অস্য সর্ব্বথাত্মৈবাভূৎ" এই অংশের এই অর্থই করিতে হইবে। যাঁহারা "সর্ব্বথা" এই পদটীর প্রকৃত ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ জানেন, তাঁহারা এই ব্যাখ্যার কখন বিরোধী হইবেন না।

কোন কোন পুস্তকে "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" এই পাঠ দেখা যায়; তাহারও ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ করিতে হইলে "সর্ব্বথা" এই পদঘটিত বাক্যের যে অর্থ প্রদর্শিত হইল, সেই অর্থই করিতে হইবে। অর্থ এই,— "সর্ব্বং" এই পদটী কর্ম্মপ্রত্যয়ান্ত দ্বিতীয়ান্ত শব্দ, এ স্থলে "আশ্রিত্য" এই 'যপ্' প্রত্যয়ান্তের অধ্যাহার করা আবশ্যক। এইরূপ অধ্যাহার করা অসঙ্গত নহে। কারণ, তাহা করিবার অনুশাসন আছে। যথা,—কালভাবাধ্বদেশানামন্তর্ভূতক্রিয়ান্তরৈঃ। সর্ব্বৈরকর্ম্মকৈর্যোগে কর্ম্মত্বমুপজায়তে॥ "সর্ব্বং" শব্দে পূর্ব্বদর্শিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপ ভাব অর্থাৎ ধর্ম্ম। "আত্মৈবাভূৎ" ইহার অর্থ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন,“সর্ব্বং” পদটী ও “আত্মা” পদটী বিশেষ্য-বিশেষণ-তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহারা কি তাল-কাণা! তাহা হইলে পুংলিঙ্গ “সর্ব্ব আত্মৈবাভুৎ” ইহাই প্রযুক্ত হইত। কারণ,ইহার অব্যবহিতপূর্ব্বেই যখন “ইতর ইতরং পশ্যতি” এইরূপ পুংলিঙ্গ রহিয়াছে, তখন সেই উপক্রান্তবাচী সর্ব্ব শব্দ পুংলিঙ্গ হওয়াই উচিত; এবং সর্ব্বনাম-বাচক শব্দার্থের সহিত যে পদার্থের অভেদ অন্বয় হইবে, সেই পদের যে লিঙ্গ থাকিবে, সর্ব্বনাম পদটীও সেই লিঙ্গ হইবে। ইহা ব্যুৎপন্নমাত্রেই অবগত আছেন। “সর্ব্বো মনুষ্যঃ” ইহাই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, “সর্ব্বং মনুষ্যঃ” এ প্রয়োগটী কেহ কখনও করিয়াছে, ইহা তে দেখা যায় না; এবং ছন্দোগ্য উপনিষদে “তৎ সত্যং স আত্মা” এই বাক্যের আত্মবিশেষণ-তাৎপর্য্যে সর্ব্বনাম “তৎ” শব্দটী পুংলিঙ্গেই প্রযুক্ত দেখা যায়। “সর্ব্বং” বা “সর্ব্বথা” ইহার যাহা ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ করা হইল, অদ্বৈতবাদী-মতে তাহা বাধিতার্থক। তাহার কারণ, যে সময়ে কেবল ব্রহ্মই হইবেন, সে সময়ে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহই থাকিবে না; এবং ব্রহ্মগত কোন ধর্ম্মও তাঁহারা স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতে ‘সর্ব্বথা’ কিংবা ‘সর্ব্বং’ পদটী কিরূপে খাটিবে?

অদ্বৈতবাদি-মত-পোষক কোন শাব্দিক ব্যক্তির আশঙ্কা। “গোদোহমাস্তে” এই উদাহরণ থাকায় “কালভাবাধ্বদেশানাং—”এই কারিকা-স্থিত ভাব-পদটীকে ভাবকৃদন্ত নাম বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রুতিস্থ “অস্য সর্ব্বং” এই সর্ব্বনামপদের উত্তর বিভক্তিকে অকর্ম্মক ভূ-ধাতু-যোগে কর্ম্ম-দ্বিতীয়া বলিয়া যে ব্যাখ্যা করা হইল, উহা ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ নহে। ইহার সমাধান, ‘কাল’ শব্দ, ‘অধ্ব’ শব্দ, ‘দেশ’ শব্দকে যখন কাল, দেশ,অধ্বরূপ অর্থ-তাৎপর্য্যক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, তখন ঐ কারিকাস্থিত “ভাব” পদটীকেও শাব্দিকগণের পরিভাষালব্ধ দোহ, অবগতি, কৃতি

প্রভৃতিরূপ ক্রিয়া-তাৎপর্য্যক বলাই তো যুক্ত। দোহন মাত্রই ক্রিয়া, জ্ঞান প্রভৃতি ক্রিয়া নহে, এ কথা বলা স্বতন্ত্রতা-মাত্রের পরিচায়ক। ঐ "ভাব" পদটীকে 'লক্ষণা' করিয়া যে ভাব-কৃদন্ত বুঝিতে হইবে, ইহার কোন প্রামাণিক ব্যক্তির লিখন দেখা যায় না। অতএব 'গোদোহমাস্তে' এই বাক্যস্থ 'দোহ' পদটী ক্রিয়া-বোধক বলিয়া ঐ নামের পরে যেরূপ কর্ম্ম দ্বিতীয়া-প্রয়োগ অব্যুৎপন্ন নহে, সেইরূপ "গো-দোহং করোতি, তমাস্তে" ইত্যাদি স্থলেও দোহন-তাৎপর্য্যক তদাদি সর্ব্বনাম পদোত্তর কর্ম্ম-দ্বিতীয়া-প্রয়োগ কিছুমাত্র অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয় না। কারিকাস্থ "ভাব" পদের দর্শিত প্রকার অর্থই যদি সঙ্গত হইল, তবে জ্ঞান ও ইচ্ছা এবং কৃতি এই অর্থ-তাৎপর্য্যক শ্রুতিস্থ "সর্ব্ব" পদের উত্তর কর্ম্মদ্বিতীয়া প্রয়োগে কোন বাধা দেখা যায় না। শাব্দিকগণেরা "কৃতীচ্ছা জ্ঞানান্যভূৎ" এ প্রয়োগটীকে অনিচ্ছা থাকিলেও তো অসাধু বলিতে পারিবেন না।

আত্মার সহিত 'সর্ব্বং' ইহার অভেদ অন্বয় করিলে আরও একটী তুচ্ছ দোষ দেখা যায়। তাহা হইলে "অস্য" এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ না থাকিয়া "সর্ব্ব-মিদমাত্মা" এইরূপ প্রথমান্ত পদই থাকিত। অন্য স্থলে এই প্রথমান্ত পদই তো দেখা যায়। যথা,—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এখানে তো 'অস্য' প্রয়োগ করেন নাই। প্রকৃত ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহাতে ষষ্ঠ্যন্ত প্রয়োগই আবশ্যক। এই ষষ্ঠীর প্রসিদ্ধ অর্থ আধেয়ত্ব। এই জন্যই ব্রহ্মগত "সর্ব্বজ্ঞত্বাদি" লাভ হইয়াছে। অদ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, "সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" এখানে 'আত্মা' পদ পুংলিঙ্গ থাকিলেও এবং তাহার সঙ্গে 'সর্ব্ব' পদার্থের অভেদ অন্বয় হইলেও বেদত্বাদিরূপ মহাবাক্যত্ব প্রযুক্তই লিঙ্গব্যত্যয় হইয়াছে। ইহা বড় হাসির কথা! আনুশাসনিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া যদি ঋষি-বাক্যের উপপত্তি করা যায়, তাহা হইলে কেবল মহা-বাক্যের দোহাই দিয়াই উপপত্তি করা কোনও ব্যুৎপন্ন দূরদর্শীরই সম্মত নহে।

ঐ শ্রুতিটী দৃশ্য এবং দর্শনকর্ত্তা ব্রহ্ম, এই তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত নহে, তাহা হইলে "ইতরঃ ইতরং পশ্যতি" এইরূপ পুংলিঙ্গ না থাকিয়া, "দ্বৈতমিব" এই ক্লীবলিঙ্গ শব্দের ন্যায় "ইতরৎ ইতরৎ পশ্যতি" এইরূপ ক্লীবলিঙ্গ ইতর শব্দই থাকিত, কারণ, অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্ম ইতরৎ সৎ, ইতরৎ স্বং পশ্যতি এই অর্থই তো করিতে হইবে ; এবং "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" এই পুংলিঙ্গ শব্দ না থাকিয়া "কিং পশ্যেৎ" এই ক্লীবলিঙ্গ শব্দই প্রযুক্ত হইত। কারণ, ঐ অংশের তৎ স্বং কিং পশ্যেৎ এই ব্যাখ্যাই তো তাঁহা-দিগের করিতে হইবে। কেহ কেহ "কং" ইহার পরিবর্ত্তে "কিং" এই-রূপ পাঠ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া থাকেন। ইহা বড় হাসির কথা! উপনিষদ্‌কর্ত্তা একবার বলিলেন, "অদ্বৈতমিব," আবার বলিলেন, "ইতর ইতরং পশ্যেৎ," পুনর্ব্বার উক্তি করিলেন, "কিং পশ্যেৎ," ইহাতে ঐ মহাবাক্য-প্রণেতাকে উন্মত্ত সাজান হইল না কি? বৈদিক শব্দত্ব প্রযুক্ত লিঙ্গব্যত্যয় হওয়া অসম্ভব নহে, এ কথা বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ নিজ দলভুক্তগণের নিকটেই পরম কীর্ত্তিভাক্ হউন্। এক্ষণে বুঝা গেল, অদ্বৈতবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মই মানব-কীট-পতঙ্গাদি যাবৎ শরীর ধারণ করেন, ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।

কোন কোন আধুনিক অদ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন, ন্যায়শাস্ত্রে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় স্থান অতি গৌণ। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। ন্যায়শাস্ত্রে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কথা বিস্তারে লেখা নাই, তাহাতে তর্কশাস্ত্রের কিছু ন্যূনতা হইতে পারে না। কারণ, মুক্তির প্রতি কেহ আসন্ন কারণ, কতকগুলি পরম্পরায় কারণ আছে, তাহার মধ্যে "ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান" অপেক্ষা "জীবতত্ত্বজ্ঞানই" কৈবল্যের আসন্ন উপায়। "জীবতত্ত্বজ্ঞান" অর্থাৎ জীবেতে শরীরাদি পদার্থের "তন্ন তন্ন" জ্ঞান। সেই সকল পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিলে দর্শিত "জীবতত্ত্বজ্ঞান" হইতেই পারে না।

মুক্তির আসন্নজনক সেই জীবতত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী সকল পদার্থের অবধারণ ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারাই হইয়া থাকে, এজন্য ন্যায়শাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান দর্শন বলিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন যাবদভিজ্ঞব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিগণিত হইয়াছে। মুক্তির প্রতি জীবতত্ত্বজ্ঞানই যে আসন্ন কারণ ও জীবতত্ত্বজ্ঞানই যে জ্ঞান-পদ-বাচ্য, তাহা গীতায় ভগবদুক্তি দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশিত আছে। এ বিষয় "কাশী-বাস" গ্রন্থের এয়োদশ পরিচ্ছেদের ১৯৬ পৃঃ ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের ১৯৭। ১৯৮ পৃষ্ঠা দেখিলেই অভিজ্ঞগণ বুঝিতে পারিবেন। মুক্তির মুখ্য উপায় জীবতত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী সকল পদার্থজ্ঞান ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারাই হইয়া থাকে, ভগবান্ অক্ষপাদ ও কণাদ দুইটী সূত্রের দ্বারাই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন; এবং মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশোপাধ্যায়, উদয়নাচার্য্য, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি যাবৎ সুধী ব্যক্তিও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

গঙ্গেশোপাধ্যায়ের উক্তি এই,—

জগদেব দুঃখ-পঙ্ক-মগ্নমুদ্দিধীর্ষুর্ভগবানক্ষপাদ আন্বীক্ষিকীং প্রণিনায়।

উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

সৎপক্ষপ্রসরঃ সতাং পরিমল-প্রোদ্বোধ-বদ্ধোৎসবো,
বিম্লানো ন বিমর্দ্দনেঽমৃতরসপ্রস্যন্দমাধ্বীকভূঃ।
ঈশস্যৈষ নিবেশিতঃ পদযুগে ভৃঙ্গায়মানভ্রম-
চ্চেতো মে রময়ত্ববিঘ্নমনঘো ন্যায়প্রসূনাঞ্জলিঃ॥

শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন,—

উদ্দেশপর্ব্বণ্যথ লক্ষণেঽপি,
দ্বিধোদিতৈঃ ষোড়শভিঃ পদার্থৈঃ।
আন্বীক্ষিকীং যদ্দশনদ্বিমালীং,
তাং মুক্তিকামাকলিতাং প্রতীমঃ॥

এক্ষণে যদি কেহ বলেন, জীবতত্ত্বজ্ঞানটা মুক্তির কারণ নহে, তবে তাঁহাদের নিতান্ত চাপল্য অথবা তাঁহারা শাস্ত্রার্থ-মীমাংসানভিজ্ঞ।

জগদ্‌বিখ্যাত নবদ্বীপস্থ প্রধান গ্রন্থপ্রণেতা গদাধর ভট্টাচার্য্য স্বকৃত "মুক্তিবাদ" গ্রন্থে "ন বারে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মা বারে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদি-ধ্যাসিতব্যঃ পশ্চাৎ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ এতাবদরে খল্বমৃতম্।" এই শ্রুতিটীর প্রথম "আত্ম" পদটী "জীব" পর হওয়ায় শেষের "আত্ম" পদটীকেও "জীবাত্ম" পর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপক্রমে যে অর্থ-বোধক যে পদটী থাকে, পশ্চাৎলিখিত সেইরূপ পদটী সেই অর্থেরই বোধক হইয়া থাকে, এই যুক্তিও দেখাইয়াছেন। যদি কেহ এমন কথা বলেন, গদাধর ভট্টাচার্য্য বুঝেন নাই, তবে সে কথা উন্মত্তোক্তি কি না, তাহা বিজ্ঞলোকে অবধারণ করিতে সমর্থ।

ব্রহ্ম দ্বিবিধ ;—জীব-ব্রহ্ম ও পরম-ব্রহ্ম। কুসুমাঞ্জলিটীকাকার হরিদাস রামভদ্র প্রভৃতি-ধৃত প্রমাণ এই, "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ।" এবং শ্রুতি, "পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" প্রথম মহাবচনস্থ "দ্বে ব্রহ্মণী" এই অংশের অবাধিতার্থকত্ব, ও "পরঞ্চাপরমেব চ" এই অংশটীর বিবরণ-পরত্ব, ব্রহ্মপদার্থ দ্বিবিধ না হইলে শতবার রোদন করিলেও উপ-পন্ন হইতে পারে না। জ্ঞেয় ব্রহ্মই পরম, জ্ঞাতা ব্রহ্ম পরম নহে, দ্বিতীয় প্রমাণ দ্বারা ইহা কি সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে না? এবং দ্বিবিধ ব্রহ্ম না থাকিলে এক ব্যক্তি-তাৎপর্য্যে পরম শব্দ-প্রয়োগটী ব্যর্থ হইয়া উঠে। পরম শঙ্করাচার্য্য, পরম গঙ্গেশোপাধ্যায়, পরম কৃষ্ণ, পরম বলরাম, এরূপ প্রয়োগ কেহই তো কখন করে না। "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চা-পরমেব চ" এই মহাবাক্যের দ্বারা ইহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অগ্রে পরমব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞান, পশ্চাৎ জীবব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞান হইলে নির্ব্বাণলাভ হয়।

তাহার হেতু, ঐ মহাবাক্যে "পরঞ্চাপরমের চ" এই শব্দ-ক্রম রহিয়াছে। কোন বাধক না থাকিলে শব্দক্রম লইয়া শাস্ত্রার্থ নিরূপণ করা সকল মীমাংসক-সম্মত।

এক্ষণে সুধী ব্যক্তিগণের নিকট প্রার্থনা এই, তাঁহারা "কাশীবাস" গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া যেন এই পরিশিষ্ট-খানি পাঠ করেন; কারণ, ইহা কাশীবাস গ্রন্থেরই পরিশিষ্ট। "কাশী-বাস গ্রন্থখানি সম্যক্ আলোচনা করিয়া এই পরিশিষ্ট পাঠ করিলে সুধীগণ বিশেষ তৃপ্ত হইবেন, ইহা আমার বিশ্বাস।

এই পরিশিষ্টে আমার পরমদেব পিতাঠাকুর মহাশয়ের যৎকিঞ্চিৎ স্মৃতিচিহ্ন না থাকিলে মৎকৃত গ্রন্থখানিই বিফল, এই বোধে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার রচিত কয়েকটী শ্লোক এই পরিশিষ্ট গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিলাম। তিনি কোনও সময় শোকাবিষ্ট হইয়া আক্ষেপ করতঃ এই শ্লোকটী বলিয়া-ছেন, যথা ঃ—

স্থাণো বিদ্ধি ন বা ভবাব্ধিতরণৈস্ত্বন্নামসংকীর্ত্তনৈ-
স্ত্বদ্ধ্যানৈশ্চ মুদং সমেত্য সময়ং সংযাপয়ামো বয়ম্।
শ্রীখণ্ডাচলচারুচন্দনতরোর্মন্দানিলৈঃ সৌরভং,
জিঘ্রন্ মোদভরং বিভর্ত্তি কিমিদং বিন্ধ্যাদয়ং পাদপঃ॥

মর্ম্মার্থ।

ওহে স্থাণু! জান কিংবা নাহি জান তুমি,
ভবসিন্ধুকর্ণধার তব নামগান আর
তব ধ্যান করি' হর্ষে দিন যাপি আমি।

মলয়-অচলে থাকে যে তরু চন্দন,
যাহার সৌরভচয় মন্দ গন্ধবহ বয়,
সেই গন্ধে আমোদিত হয় সর্ব্বজন
চন্দন-পাদপ তাহা জানে কি কখন্?

অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পিতৃদেব মহাশয়ের যেরূপ সংস্কার, তৎ-প্রকাশক তাঁহার রচিত এই শ্লোক ঃ—

বেদান্তবাক্‌কণমথাপ্যনুমানলেশ-
মদ্বৈতবাদবলদং ন বিলোকয়ামঃ।
তস্মাত্তথাপি রসরাশিপিপাসবশ্চে-
দাকাশসারসরসং রসিকাঃ পিবন্তু॥

চতুষ্পাঠীতে প্রাচীনরীত্যনুসারে দর্শনশাস্ত্রাদির পাঠনাই পূজ্যপাদ পিতৃদেবের অতি প্রীতিকর। পাশ্চাত্যরীতিতে দুই একটী সাধুভাষায় দর্শনাদি শাস্ত্রের পাঠনা তাঁহার অতি বিদ্বেষ্য। পাশ্চাত্যরীতিতে দর্শনাদি-শাস্ত্র-পাঠনায় যে কোনও ফল-লাভ হয় না, ইহা পূজ্যপাদের একান্ত বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে তাঁহার শ্লোক এই ঃ—

পাশ্চাত্যপ্রথয়ৈব শিক্ষকবচোভঙ্গ্যা কৃতার্থীভবন্,
মত্তো মর্ত্ত্যজনেষু যো বুধবরং স্বং মন্যতে মোদতে।
যস্মিন্ শস্যচয়ঃ পয়শ্চ মধুরং স্বাদে সুধাসোদরং,
হা হা তস্য ন কিং গতং চিরদিনং তৎত্বগ্‌রসাস্বাদনৈঃ॥

মর্ম্মার্থ।

পাশ্চাত্যরীতিতে শিক্ষা কিবা মনোহর,
শিক্ষকের বচোভঙ্গী তাহে কি সুন্দর।

সেই রীতি সেই বাগ্‌ভঙ্গী অনুসারে,
যুবাগণ দর্শনাদি শাস্ত্র শিক্ষা ক'রে,
কৃতার্থ হইয়া নিজে ভাবে, বুধবর—
মোর সম এ জগতে কে আছে অপর!
সুধার সমান যার সুমধুর জল
মিষ্ট শস্য যার, নাম নারিকেল ফল,
না খেয়ে সে মিষ্ট শস্য না পিয়ে সে বারি,
হায় হায় ছোব্‌ড়া চুষে দিবস-শর্ব্বরী
গেল না কি, অভিমানে মত্ত সে যুবার,
পাশ্চাত্যরীতিতে শিক্ষা হইয়াছে যার?

পূর্ব্বে কাশীবাস গ্রন্থে পিতৃদেব-কৃত অনেক শ্লোক দেওয়া হইয়াছে। পরে অনুসন্ধান করিয়া খসড়া কাগজে একটী সংস্কৃত গদ্য পাইলাম এবং কোন সময়ে কোন ছাত্রের আবশ্যকমত একটী গদ্য রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, ঐ ছাত্রের প্রমুখাৎ সেই গদ্যটী অবগত হইলাম। আমার বিশ্বাস, ঐ দুইটী গদ্য অভূতপূর্ব্ব। পিতার রচিত বলিয়া এরূপ বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব নহে। ইহাও পিতৃদেবের স্মৃতিচিহ্ন বিবেচনায় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিলাম। হাতুয়া-মহারাজ-সম্বন্ধীয় একটী কবিতা "কাশীবাস" গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে এবং সম্প্রতি অনুসন্ধানে উক্ত মহারাজ-সম্বন্ধীয় পিতৃদেব-রচিত চারিটী শ্লোক পাইলাম। ঐ শ্লোক কয়েকটী নিতান্ত মধুর বলিয়া বোধ হইল। এই প্রকার কোন রাজ-সম্বন্ধীয় শ্লোক যে কখন হইয়াছে, ইহা আমার ধারণা না থাকায় উক্ত চারিটী কবিতাও এই পরিশিষ্ট গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। গদ্য যথা—

সমধিকৃত-সর্ব্বাবনি-সর্ব্বজননী-প্রতিনিধিবর-প্রসাদ-প্রকাশিত-মহামহোপাধ্যায়োপাধিকেন বাশিষ্ঠ-কুল-সমুজ্জ্বলালোক-সমান-দেদীপ্যমান-মহর্ষিসম-

শমদমাদি-পূত-চেতো মহাত্মসংঘসংশোভিত-বিবিধ-বিদ্যাধ্যাপনাধ্যয়ন-কলধ্বনি-পূরিতামর-তরঙ্গিণী পূর্ব্বপ্রতীর-অঙ্গ-বঙ্গজন-পদাঙ্গ-ভট্টপল্লী-সংজ্ঞ-ভূভাগোদ্ভূতি-ভূতপূর্ব্ব-বাসেন সতত-সদুপগীতগুণ-প্রশস্তি-হস্তিনাধিপতি-মহারাজদ্বিজরাজ-শ্রীমৎকৃষ্ণপ্রতাপনামধর-কল্যাণবর-সমাদর-প্রদত্তাং পরিজনগণ-প্রতিপালনোপযোগিনীমযাচিত-বৃত্তিমধিকৃত্য প্রীতমনসা শ্রীবিশ্বেশ্বরকৃপালেশলিপ্সয়ামরনগরাদপি গরীয়সীং গৌরীশপ্রেয়সীং বারাণসীং সমধিতিষ্ঠতা শ্রীরাখালদাস-ন্যায়রত্ন-দেবশর্ম্মণা প্রণীতোঽয়ং নবনিবন্ধঃ ॥১॥

বারাণস্যাং শরীরান্তবাসবাসনয়া সুরতরঙ্গিণী-পরিবর্জ্জিত-জন্মজনপদাবাসমপাস্য শ্রীশ্রী৺পরমনগর্য্যাং প্রাংশঃ ষোড়শবর্ষাণ্যবসং তত্র চ কতিপয়-কালানতি-পাত্যামন্দ-মন্দিরাদিক-মন্দাকিনী-পরিশোভিত-মহেন্দ্রপুরীসম-পরমশোভাধর-রামনগর-প্রভৃত্যশেষ-ভূভাগ-স্বামিনঃ কাশীনেরেশস্য দুর্গেতি পরমাক্ষরমন্ত্রপ্রজপনময়-স্বস্ত্যয়নমধিকুর্ব্বন্ প্রতিমাসং রাজকার্য্যদক্ষস্য ব্যবস্থয়া দক্ষিণাত্মক-মুদ্রাপঞ্চকময়ীং রাজবৃত্তিমুপাদায় জায়াদায়াদাদিকং কথমপি প্রতিপালয়িতুং প্রভবামিস্ম। ইদানীং শ্রীমদনুকম্পায়ামুপক্ষীণায়াং সম্ভবন্ত্যামবশ্যম্ভাবি-পরমধাম-নিবসন-ব্যসনাবধারণং ব্যথয়তিতরাং শ্রীমদাশ্রিতস্য হৃদয়মশনিসংঘাতপাতবৎ। কল্পতরুকল্পসমীপেষলমনল্পজল্পনেন ॥ ২ ॥

শ্লোক যথা,—

নিত্যং সত্ত্বগুণোত্থকার্য্যকরণাৎ সত্যে চ চিত্তার্পণাৎ,
সাক্ষাদ্ধর্ম্মসুতোঽসি বৈ নৃপমণে ভীমোঽসি দুঃশাসনে।
জিষ্ণুর্ভীষ্মমদাদিদুর্জ্জয়রিপূন্ হত্বাসি তত্তে পুরী-
মস্ত্যেষামপভাবয়াতিমলিনাং বিদ্মো বয়ং হস্তিনাম্ ॥
পৃথ্বীদেবতয়া সদা বহুশদানীতাঃ সুধালিপ্সয়া,
কিন্তু কাপি কদাপি কৈরপি সুধালেশেন নো তোষিতাঃ।

ত্বত্তঃ সৎসুখদাং সমাদরসুধাং লব্ধ্বাত্র তৃপ্তা বয়ং,
যুক্তা তদ্দ্বিজরাজতা ত্বয়ি ধরা শীতদ্যুতে ভূপতে ॥
কৃত্বাঙ্কে শুভদীর্ঘজীবতনুজং রাজ্যং নিজং গম্যতাং,
ভদ্রং বর্ত্মনি বর্ত্ততাঞ্চ ভবতশ্চায়ুর্যশো বর্দ্ধতাম্।
গত্বা চৈব পুরঃ পুরঃ পুরভিদা ভক্তো ভবান্ রক্ষ্যতাং,
মাদৃগ্ভির্দ্বিজরাজ তে সুমুদয়ঃ কাশ্যাং পুনর্দৃশ্যতাম্ ॥
বাসং যঃ কুরুতে গুরোস্ত্রিজগতাং শীর্ষে শশাঙ্কস্ত্বসৌ,
বৃদ্ধিং প্রাপ্য কদা সুধাস্পদমপি ক্ষীণোঽস্তু হীনঃ করৈঃ।
মা ভূয়াদ্দ্বিজরাজ তে ক্ষিতিপতে ক্ষেমে কদা ক্ষীণতা,
যৎ শম্ভোঃ পদপুষ্করং ভজসি ভো ভূযৈব সেবাশয়া ॥

আমি অদ্বৈবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদের শ্রবণ ও চর্চ্চা করায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। কারণ, মহর্ষিবাক্য এবং শিববাক্যের লঙ্ঘন করা হইয়াছে। তাঁহাদের বাক্য এই,—

পরাত্মজীবয়োরৈক্যং তত্র চ প্রতিপাদ্যতে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি ॥

এক্ষণে শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা,—

জীবে ব্রহ্মণি চৈকতা যদুদিতা মায়া চ যৎ সম্মতা,
তচ্ছাস্ত্রং শ্রুতিবোধিতার্থবিধুরং শ্রোতুস্ততঃ পাপদম্।
নিন্দ্যং তৎ খলু খণ্ডনার্থমসকৃজ্জুষ্টং শ্রুতং যন্ময়া,
দোষং নাশয় তদ্ভবং ভব তব শ্রীপাদদাসস্য মে ॥

সমাপ্ত।

৺হরকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত।

পূজ্যপাদাম্বুজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় এক সময়ে অপুত্রক হইয়া "পুত্রার্থিনা সার্দ্ধসহস্রমর্চ্চ্যং" এই প্রমাণানুসারে অতিনিয়মী হইয়া সৎপুত্র-কামনায় দেড় হাজার পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা এবং গ্রহহোম প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠান করাইয়া ঐ সকল বৈধকার্য্যের পরে এক বৎসরের মধ্যেই পুত্র লাভ করেন। ঐ পুত্রলাভ ৺শিবকৃপারই ফল, এই বিশ্বাসে ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ বালকের হরকুমার নাম রাখেন। ঐ সুলক্ষণ পুত্র জন্মিবার পরে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মহিষাদল-রাজবাটীতে বার্ষিক ৭৫৲ টাকা চিরবৃত্তি অবধারিত হয়। সন ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ১৭ই তারিখে কলিকাতার ১২ ক্রোশ উত্তরে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ৺ভাগীরথীর পূর্ব্বোপকূল ভট্টপল্লী গ্রামে হরকুমার শাস্ত্রী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

হরকুমার পিতার একান্ত অনুগত ছিলেন। তিনি যখন অতি শিশু, সেই সময়ে রোদন করিতেছেন; কোনরূপে শান্ত হইতেছেন না; তখন ন্যায়রত্ন মহাশয় যদি বলিতেন, "আর কেঁদো না," তবে তৎক্ষণাৎ ঐ দুগ্ধপোষ্য বালক রোদন হইতে নিবৃত্ত হইতেন। ঐ বাল্যাবস্থাতেও পিতার প্রতি তাঁহার একান্ত বিশ্বাস ছিল। যখন হরকুমারের তিন বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম, সেই সময় রাত্রিকালে মনুষ্যশূন্য অন্ধকারময় গৃহে একটী বস্তু রহিয়াছে, ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই স্থান হইতে তিন বৎসর-বয়স্ক ঐ বালককে "বাবা, ও স্থানে কোন ভয় নাই," এই কথা বলিয়া ঐ বস্তুটী আনিতে বলিলে, পিতৃবাক্য-বিশ্বাসে নির্ভীক হইয়া সেই অন্ধকার-গৃহস্থিত বস্তু আনিবার

জন্য উদ্‌যোগী হইতেন। হরকুমার শাস্ত্রীর যখন পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অতি দূরদেশ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র আসিলে ঐ বালক গর্ভধারিণীর স্নেহের কিছুমাত্র বাধ্য না হইয়া পিতার সহিত গমন করিতে এতই ব্যস্ত হইতেন যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ঐ বালককে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত। হরকুমারের ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ পিতৃভক্তিও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

হরকুমার শাস্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পঞ্চম বর্ষে বিদ্যারম্ভ না হইয়া ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। তিনি একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত মাইনার স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া,পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, হুগলী-কলেজে দুই বৎসর ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ঐ অল্পকালমধ্যে ইংরাজী বিদ্যায় এতই ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, ইংরাজীর বহু গ্রন্থই অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন, এবং বাঙ্গালা ভাষায় সেই সকল ইংরাজীর সুন্দররূপে অনুবাদ করিতে পারিতেন। ইংরাজী অধ্যয়ন করা নিজ বংশোচিত কার্য্য নহে, ইহা বিবেচনায় হরকুমার শাস্ত্রী চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমে সংস্কৃত-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও নৈষধান্ত পাঠ্যকাব্যের সম্যক্ আলোচনা করিয়া বিশেষ ব্যুৎ-পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, অজ্ঞাত দুরূহ সংস্কৃত কাব্য অনা-য়াসে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। ঐ সময়ে তাঁহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় গদ্য-পদ্য-রচনা-বিষয়ে অদ্বিতীয় শক্তির আবির্ভাব হয়। সেই সময় তিনি সংস্কৃতকাব্য "বৃন্দাবন-কল্পলতিকা" ও বাঙ্গালা নাটক "শঙ্করাচার্য্য", "নুর-জাহান," "কল্কিপুরাণ," "ত্রিপুরাচরণ" প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্য ও নুরজাহান এই দুইখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। অবশিষ্ট গ্রন্থ অমুদ্রিতাবস্থাতেই আছে।

হরকুমার শাস্ত্রী অষ্টাদশ বর্ষে দারপরিগ্রহ করেন। তিনি বাল্যাবধি

ঐ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ভাটপাড়ায় থাকিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও কখন অসন্তোষের কার্য্য করেন নাই; ভাটপাড়াবাসী যাবদ্‌ব্যক্তির একান্ত স্নেহ ও আদরের পাত্র ছিলেন; বাল্যচাপল্যবশতঃ কখনও কাহারও সহিত বিবাদ-বিসংবাদ করেন নাই; শৈশবোচিত ক্রীড়া এবং যৌবনোচিত ক্রীড়া অর্থাৎ তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতি কোন ক্রীড়াই কখনও করেন নাই; বিদ্যারম্ভের পর হইতে কেবলমাত্র বিদ্যাচর্চ্চাতেই একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। ফল কথা, শাস্ত্রিমহাশয়ের গুণের কথা ভিন্ন যৎকিঞ্চিৎ নিন্দার কথা কখনও কোন ব্যক্তির কর্ণগোচর হয় নাই। তাঁহার দ্বাদশবর্ষে উপনয়ন হইয়াছিল, তদবধি ত্রিসন্ধ্যা শিবপূজা ও নারায়ণপূজা একদিনের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই।

হরকুমার শাস্ত্রীর ঊনবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীশ্রী৺কাশীধামে চিরবাসে কৃতসংকল্প হইয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় ভাটপাড়া পরিত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে আগমন করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ও তদবধি পিতৃসেবার্থ পিতৃ-সন্নিধানেই ছিলেন।

হরকুমার শাস্ত্রী পিতাকে দেবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, পিতৃদেবে কাব্যরচনায় শ্রীহর্ষশক্তি, তর্কোদ্ভাবনে গৌতমশক্তি ও সদুপদেশ-বিষয়ে ঋষিশক্তি এই ত্রিবিধ শক্তিই সমভাবে বিদ্যমান। পিতার অনভিলষিত কার্য্য তিনি কখনও করেন নাই। আবশ্যক কার্য্যানুরোধে পিতার অনুমত্যনুসারে সময়ে সময়ে কলিকাতা-প্রদেশে গমন করিতেন; তত্রত্য শিষ্যগণের নিকট যাহা লব্ধ হইত এবং রাজা বা ধনী লোকের নিকট পারিতোষিক-স্বরূপ যে অর্থ পাইতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পিতৃ-সন্নিধানে প্রেরণ করিতেন; নিজ প্রয়োজনের জন্য স্বাধীন-ভাবে এক টাকাও রাখিতেন না। স্বকীয় ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পিতার নিকট সম্ভবতঃ বার্ষিক একশত টাকা চাহিয়া লইতেন। হরকুমার শাস্ত্রী নিজের

পরিচ্ছদাদি-আড়ম্বরের জন্য কখনও এক টাকাও ব্যয় করেন নাই। তাহাতে তাঁহার উপেক্ষাই ছিল; ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তিনি একমাত্র পুত্র ছিলেন, সুতরাং তিনি যাহা ইচ্ছা করিতেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় অবশ্যই তাহা পূরণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তদ্বিষয়ে তিনি কখনই পিতার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন নাই।

হরকুমার শাস্ত্রী পিতার নিকট বার্ষিক যে এক শত টাকা চাহিয়া লই-তেন, তন্মধ্যে পঞ্চাশ টাকা নিজ মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া অর্পণ করিতেন; অপর টাকা ভিক্ষুক ফকির অনাথ অনাথা প্রভৃতিকে দান করিতেন; পৌরোহিত্যাদি কার্য্যে ব্রতীদিগকে ন্যায়রত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সম্ভবমত দক্ষিণা অর্পণের পর ঐ ব্রতীগণকে অধিক সন্তোষ করিবার জন্য কখন কখন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গোপন করিয়া শক্ত্যনুসারে নিজ হইতে অর্থ প্রদান করিতেন।

হরকুমার শাস্ত্রীর মাতার প্রতিও বিশেষ ভক্তি ছিল। তিনি মাতাকে দেবী বলিয়া বিবেচনা করিতন; হরকুমার শাস্ত্রীর জন্মাবধি তাঁহার মাতা ৺সুপ্রভা দেবী হরকুমারের শুভকামনায় প্রতিদিন একটী করিয়া পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন। নিজের উন্নতিলাভ ও পিতৃসেবার্থ কাশীধামে অবস্থিতি, মাতার ঐ শিবারাধনারই ফল, ইহা শাস্ত্রিমহাশয়ের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। মাতা সুপ্রভা দেবী ১৩০৫ সালে ৺গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শাস্ত্রী মহাশয় একটীও মাসিক শ্রাদ্ধ পতিত করেন নাই; ৺গঙ্গাগর্ভে প্রত্যেক মাসিক শ্রাদ্ধই করিয়াছেন। তাহাতে রৌদ্রাদির তাপজন্য বহু ক্লেশ হইলেও শাস্ত্রী মহাশয় কুণ্ঠিত হইতেন না। পাছে ঐ সকল মাসিক শ্রাদ্ধ পতিত হয় এবং কাশী-গঙ্গায় ঐ সকল শ্রাদ্ধ পাছে না হয়, এই বিবেচনায় নিয়মী হইয়া, বিশেষ প্রয়োজন থাকিলেও ঐ এক বৎসর কাল কাশী ত্যাগ করিয়া কলিকাতা-প্রদেশে কি অন্য কোন স্থানেই

গমন করেন নাই। কেবলমাত্র ত্রিপক্ষে বৃষোৎসর্গ করিবার মানসে পিতার অভিপ্রায়ানুসারে পাঁচ সাত দিনের জন্য ভাটপাড়ায় গমন করিয়াছিলেন।

হরকুমার শাস্ত্রীর আটটী ভগিনী ছিলেন, তন্মধ্যে এক্ষণে পাঁচটী ভগিনী বিদ্যমান। তিনি ঐ ভগিনীগণকে বিশেষ ভালবাসিতেন; ভগিনী-গণও তাঁহাকে একান্ত স্নেহ করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের কি উন্নত চিত্ত ও কি দয়াই ছিল; গত বর্ষে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ৺শিবসীমন্তিনী দেবী বিধবা হইলে তিনি সেই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া, ৺কাশীধাম হইতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ ভগিনীর গৃহে (রাজপুরে) গমন করতঃ নাবালক পাঁচটী শিশুসন্তান সহ ঐ ভগিনীকে লইয়া প্রথমে নিজ ভাটপাড়ার বাটীতে জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীর নিকট রাখিয়া আসেন। কিছুদিনের পরই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত তাঁহাকে নাবালক শিশুসন্তান সহ পুনরায় ৺কাশীর বাটীতে লইয়া আসেন। তাঁহাকে এখানে আনিলে পর শাস্ত্রী মহাশয়ের হিতৈষী প্রাচীন বিজ্ঞলোক কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, 'হরকুমার! তুমি রাজপুর হইতে সংসার তুলিয়া পাঁচটী শিশুসন্তান সহ তোমার ভগিনীকে যে এখানে আনিলে, ইহা কি ভাল যুক্তি হইল? রাজপুরে উহাদের আত্মীয়স্বজন আছেন, সেইখানেই রাখিয়া বরং মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিলে হইত না? অবশ্য ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেহ যত দিন আছে, তত দিন কোন চিন্তার বিষয় নাই, কিন্তু পরে ঐ নাবালক পাঁচটী শিশুসন্তান যত দিন সাবালক ও যোগ্য না হয়, তত দিন তাহাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা করান, কন্যাগণের বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি সকল কার্য্যই তোমার ঘাড়ে পড়িবে, তুমি এত ব্যয় কিরূপে করিবে?' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন, 'মালিক বিশ্বনাথ, তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে, এখন হইতে অত চিন্তা

করিয়া কি করিব ? শিবসীমন্তিনী শিশুসন্তানগুলিকে লইয়া সেখানে কষ্ট পাইবে, ইহা আমার সহ্য হইবে না।” সম্প্রতি শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ কনিষ্ঠা ভগিনী ৺কাশীলাভ করিয়াছেন। তাঁহার নাবালক শিশুসন্তানগণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংসারেই প্রতিপালিত হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীকে মাতৃবৎ ভক্তি করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,হরকুমার শাস্ত্রী কখনও কোন ক্রীড়াদি করেন নাই। তবে ব্যসনের মধ্যে তিনি কেবল সময়ে সময়ে একটু আধটু বেড়াইতে ভালবাসিতেন। কোন কোন সময় শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ ক্লান্ত হইলে, প্রিয়তম সহচরগণের সহিত কাশীর প্রান্তভাগে বেড়াইতে যাইতেন এবং সেই সকল নির্জ্জন স্থানে যে সকল সাধুসন্ন্যাসী বাস করেন, তাঁহাদের নিকট গমন করতঃ তাঁহাদের সহিত কথবার্ত্তা কহিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন ; সেই জনশূন্য দেশে তাঁহাদের আহারীয় সামগ্রীর কিরূপে সংস্থান হয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসাও করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ কিছু কিছু দিয়া আসিতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সাধু-সন্ন্যাসীর উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল ; নিজের সাধ্যমত তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। আমরা কোন সময় যদি বলিতাম, ‘দাদা মহাশয়, ঐ সন্ন্যাসী ভণ্ড,উহাকে অর্থ দিলে কি হইবে ?’ তিনি উত্তর করিতেন,“ভাই, সামান্যই দিতেছি, ইহাতে অত বিচার আমার নিষ্প্রয়োজন। বিচার করিয়া দেখিলেও উহারা শ্রদ্ধার পাত্র। কারণ, গায়ে ছাই মাখিয়া গাছতলায় তো বসিয়া আছে, তোমরা কৈ একদিন ঐ ভাবে থাক দেখি !” বর্ষে বর্ষে গঙ্গাসাগর-তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সন্ন্যাসীর দল কাশীতে উপস্থিত হইয়া থাকে।ঐ দলের মধ্যে কখন ১০০৲ একশত, কখন ৮০৲ কখন ৫০৲ পঞ্চাশ জন সন্ন্যাসী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট এককালীন উপস্থিত হইয়া ঐ দলের একদিন ভোজনের উপযোগী ব্যয়নির্ব্বাহার্থ

২০৲ টাকা, ১৫৲ টাকা বা ১০৲ টাকা প্রার্থনা করিলে, প্রার্থিত সমস্ত টাকা দিতে ন্যায়রত্ন মহাশয় যদি ইতস্ততঃ করিতেন, তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয় পিতার নিকট নিজে কোন কথা না বলিয়া ছাত্রদ্বারা জানাইতেন যে, "বাবা উহাদিগকে প্রার্থিত টাকা দিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন ? ঐ টাকার ন্যূন উহাদিগের এক সন্ধ্যা ভোজন নির্ব্বাহ হইবার সম্ভব নহে।" শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিপ্রায়ে ঐ টাকা অর্পণ করিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। হরকুমার শাস্ত্রী কাশীধামে আসিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং তুই বৎসর কালমাত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ প্রতিভার বিকাশ হয়। সেই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নকালে হরকুমারের শরীর বিশেষ রুগ্ন হয়। তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা দর্শন করিয়া সেই সময় ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখেন এবং শাস্ত্রচিন্তা করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু হরকুমারের চরিত্র বিজাতীয়। তিনি শাস্ত্রচিন্তা ব্যতিরেকে কোনরূপেই থাকিতে পারিতেন না; সেই অবস্থায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে বিরত হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনুমতিক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ফলিত-জ্যোতিষগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে অসামান্য বুৎপত্তি লাভ করেন ও সেই সময়ে "জ্যোতিঃকোষ" নামে একখানি জ্যোতিষের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদীর প্রধান ছাত্র ৺দীননাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট গণিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের পদ্যে বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গদেশ, মিথিলা ও কাশী প্রচলিত খণ্ডা এবং মূল সূর্য্যসিদ্ধান্ত, এই সকল গ্রন্থ অবলম্বনে বহুপরিশ্রম-সহ গণনা করিয়া একখানি পঞ্জিকা প্রণয়নও করিয়াছিলেম। এই পঞ্জিকার তিথি-

পরিমাণ ও গ্রহ-সঞ্চার প্রভৃতির সূক্ষ্ম গণনা দেখিয়া, বিশ্ব-বিখ্যাত শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বঙ্গদেশ-প্রচলিত পঞ্জিকা-গণনায় সন্দিহান হইয়াছিলেন এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শাস্ত্রী মহাশয়, মাত্র এক বৎসরের জন্যই পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পঞ্জিকা প্রণয়ন করিতে নিষেধ করায় আর ও বিষয়ে হস্তার্পণ করেন নাই। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী ও ৺দীননাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। দুই বৎসরের পর শরীর বিশেষ সুস্থ হইলে পুনরায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অধ্যবসায় বিচিত্র, যখন যাহাই ধরিয়াছেন, তখন তাহারই পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি শাস্ত্রে এত পরিশ্রম ও চিন্তা করিতে পারিতেন যে, সেরূপ পরিশ্রম ও শাস্ত্রচিন্তা এক্ষণে কেহ করিতে পারেন বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। গল্প শুনা আছে যে, পূর্ব্বে চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা শাস্ত্রবিষয়ে এতই পরিশ্রম করিতেন যে, পাছে নিদ্রা আসিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রচিন্তায় বিঘ্ন ঘটায়, এ জন্য তাঁহারা নিজ নিজ শিখাতে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি উচ্চস্থানে বন্ধন করিয়া রাখিতেন। নিদ্রা আসিয়া টলাইলেই সেই দড়ি তাঁহাদিগকে জাগাইয়া দিত। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাব বিচিত্র, তিনি শিখায় রজ্জুও বাঁধেন নাই, নস্যও লইতেন না, তথাপি নিদ্রা তাঁহার বশবর্ত্তিনী ছিল। যখনই তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি, হয় চিন্তায় মগ্ন, কিংবা লিখিতেছেন। সে সময় এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য যে, হঠাৎ যাইবামাত্র তাঁহার চৈতন্য হইত না; দুই তিনবার "দাদা মহাশয়, দাদা মহাশয়" বলিয়া ডাকিলে তবে উত্তর দিতেন। রাত্রি ১১ টার সময় কি দিবাভাগে আহারান্তে তাঁহার নিকট গিয়া দেখি, ঐ ভাব। আমরা অনেক সময় বলিতাম, 'দাদা মহাশয়, অত পরিশ্রম করিবেন না,

অসুখ হইবে।” কিন্তু তাঁহাকে একদিনের জন্যও বিরত করিতে পারি নাই। অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন তাঁহার উপলক্ষ্য ছিল মাত্র। তিনি চিন্তা দ্বারা সেই শাস্ত্রের এমন নিগূঢ়ভাব বাহির করিতেন যে, তাহা শুনিয়া তাঁহার অধ্যাপক সাধারণ সকলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেন।

হরকুমার শাস্ত্রীর পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, বুদ্ধির পরিপক্কতা, অসাধারণ আধ্যাত্মিকতা, বিচিত্রলিপি-কৌশল, অদ্ভুত কল্পনাশক্তি, প্রগাঢ় শিব-ভক্তি, অসামান্য নীতিজ্ঞতা ও উপদেশক্ষমতা দর্শন করিয়া কবি, মহাকবি, জ্ঞানী, অজ্ঞ, এমন কি, নৃপতি হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। যখন তাঁহার ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি “শঙ্করাচার্য্য” নাটকখানি প্রণয়ন করেন। বিশেষ কোন মহাপুরুষ শাপভ্রষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। নতুবা ১৭ বৎসর বয়সে ওরূপ বুদ্ধির পরিপাক ও আধ্যাত্মিকতা কি সাধারণ মনুষ্যের হইয়া থাকে? তিনি সতর বৎসর বয়ঃক্রমকালে শঙ্করাচার্য্য নাটকে যেরূপ অলোকসামান্য আধ্যাত্মিকতা ও অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পক্কবুদ্ধি মনীষিগণেরও হইতে পারে বলিয়া আমাদের বোধ নাই। আজকাল সাহিত্য লইয়া বহু আলোচনা ও আন্দোলন হইতেছে এবং অনেকে ১৬।১৭ বৎসর বয়সেও অনেক নাটক নভেল লিখিতেছেন, কিন্তু তাহা কেবল গিরি, নদী, নির্ঝর, তরু, কুমুদ, কামিনী, কুচ, কুন্দ, ইন্দু, কোকিল, কৌমুদী এবং ললিতলবঙ্গলতা, মঞ্জু কুঞ্জবন প্রভৃতি লৌকিক বর্ণনেই পর্য্যাপ্ত। ঐ তরুণ-বয়সে শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্করাচার্য্য নাটকে আধ্যাত্মিক বর্ণনায় যেরূপ শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ কখন সে শক্তি প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। লেখনী-সাহায্যে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, তবে ঐ শঙ্করাচার্য্য পাঠে বা তৎশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকখানি পত্র

মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"এই পুস্তকখানি গ্রন্থকারের কোনও আত্মীয় আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। আমার চক্ষুর পীড়া বশতঃ আমি নিজে ইহা পাঠ করিতে পারি নাই। যাহা হউক, ইহার পাঠশ্রবণে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের নীরস জীবন লইয়া যে এমন সুন্দর কাব্য রচিত হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে আমি কখনও মনেও করি নাই। কিন্তু ইহার পাঠ-শ্রবণে আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে। এই নাটকখানি, বিশেষতঃ ইহার প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক এত উৎকৃষ্ট ও হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে যে, আমি তাহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারি না। আমি এই পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করিতেছি না। কেবলমাত্র ইহার পাঠ-শ্রবণে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহাই এ স্থলে ব্যক্ত করা আমার অভিপ্রায়। গ্রন্থকার একজন প্রকৃত কবি। বিশেষতঃ ইহাঁর নাটক রচনা করিবার শক্তি এই গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অভিনয় ব্যতিরেকে নাটকের উৎকৃষ্টতা পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় না, এবং তাহা না হইলে, ইহার মনোরঞ্জনকারিতা লোকের সম্যক্‌রূপে বোধগম্য হয় না। কিন্তু ইহা যে অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি এই পুস্তক-সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে চাহি না, কেবল পাঠক-মহোদয়গণকে এই মাত্র অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন মনোযোগপূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত একবার পাঠ করেন। গ্রন্থকারের সহিত পূর্ব্বে কখনও আমার আলাপ-পরিচয় ছিল না এবং এখনও নাই। এমন কি, পরস্পরে কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু শুনিলাম যে, ইনি ভাটপাড়ার সুবিখ্যাত অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র এবং ইনিও একজন সংস্কৃতজ্ঞ-পণ্ডিত ও

সংস্কৃতে একখানি উৎকৃষ্ট কবিতা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তির বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি আদর ও তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা বাঙ্গালা-সাহিত্যের সামান্য সৌভাগ্যের কথা নয়। কারণ, আমার সংস্কার এই যে, বাঙ্গালা-সাহিত্য যদি কখনও সম্পূর্ণ পরিস্ফুটতা ও উৎকর্ষ লাভ করে, তাহা এই শ্রেণীর লেখকদিগের দ্বারাই সাধিত হইবে। সুতরাং ইহাঁর দ্বারা বাঙ্গালাভাষা যে বিশেষরূপে অলঙ্কৃত হইবে, এ আশা সম্পূর্ণ-রূপেই করা যায়। ইহাঁর নাটক রচনা করিবার শক্তি "নুরজাহান" নামক আরও একখানি গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। জগদীশ্বর ইঁহাকে দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন। কাশী সহর। ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫।"

সর্ব্বদর্শনাভিজ্ঞ কাশীর সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বপ্রধান

অধ্যাপক নৈয়ায়িক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের পত্র।

"এই পুস্তকখানি শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। বালক-ভোলান ঘটনা-বাক্যাদি দ্বারা ইহার কলেবর-পুষ্টি নহে। ইহার লক্ষ্য পরম পদার্থ। নাট্যানুষঙ্গিক প্রণয়াদি রস যাহা আছে, তাহাও চরমে পরমার্থে গিয়া লয় পাইয়াছে। ভাব, ভাষা ও ঘটনা-বৈচিত্র্যাদির সহিত অদ্বৈতবাদের, গীতার, মোহমুদ্গরের; আত্মতত্ত্বের, প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-মার্গের ও অন্যান্য যথেষ্ট বৈদান্তিক কথার সংমিশ্রণে এই উজ্জ্বল নাটক-খানিকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গদেশে আজকাল উচ্চ ইংরাজী-শিক্ষিত বহুতর বিদ্বদ্বর্গ আমাদের বেদান্তশাস্ত্রের প্রতি যথোপযুক্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি, ভাষ্যকারের পবিত্র জীবনী অভিনয়ের উপযোগী করিয়া লেখায় সেই সকল প্রকৃত গুণগ্রাহী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট গ্রন্থকার গুণপনার ও পরিশ্রমের প্রকৃত আদর প্রাপ্ত হউন।"

বৰ্দ্ধমানের—

রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর সাহেবের সন্তোষ-প্রকাশক পত্র।

"প্রণামপূর্ব্বকনিবেদনমিদং

আপনি দয়া করিয়া আপনার রচিত যে দুইখানি নাটক 'শঙ্করাচার্য্য' ও 'নুরজাহান' আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমি পরম আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া, একান্তমনে পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই উভয় নাটকেই আপনার কবিত্ব-শক্তি ও চরিত্র-গঠনের ক্ষমতা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ভাষা প্রাঞ্জল অথচ হৃদয়গ্রাহী, আর এই উভয় গ্রন্থেই পরস্পর-বিরোধী ভাবসকল একাধারে এত সুন্দর-বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে যে, তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আপনার রচিত এই গ্রন্থ দুইখানি বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে বিশেষ আদৃত হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আপনি পিতার উপযুক্ত পুত্র। 'পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।' তাই বলিতেছি, আপনার পিতৃদেব ধন্য। আপনার পিতার চরণে আমার সহস্রাধিক প্রণাম জানাইবেন। আশা করি, আপনারা উভয়েই কুশলে আছেন। ইতি—

প্রণত—শ্রীবনবিহারী কপূর।"

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবন-চরিত প্রভৃতি বহু গ্রন্থলেখক সুকবি সংস্কৃত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, প্রসিদ্ধ সুলেখক উকীল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ লোক শঙ্করাচার্য্য পাঠে মুগ্ধ হইয়া যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা "কাশীবাস" গ্রন্থের শেষে প্রকাশিত হইয়াছে, এ স্থলে বাহুল্য-ভয়ে আর সে সকল প্রদর্শিত হইল না।

চৈতন্য উপস্থিত হইলেই শাস্ত্রী মহাশয় শিবভক্তিতে এবং শিব-প্রেমে একান্ত মগ্ন হইয়াছিলেন। সেই আত্মমনোগত ভাবই নাটকে শঙ্করাচার্য্যকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য-নাটকের প্রথমেই শঙ্করাচার্য্যের উক্তিচ্ছলে একটী শিব-মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, সংক্ষেপে কৈলাস-পর্ব্বতের কি স্বাভাবিক বর্ণনা :—

কৈলাস-গিরীন্দ্র-মাঝে সদাশিব সদা রাজে
নিরুপম মনোরম ধাম।
ভয়ে রবি-শশী চলে পবন সভয়ে খেলে
সুরাসুর সকলে সমান।
পাখী গাহে শিব-গান নদীজলে কলতান
লতা নৃত্য করে দু'লে দু'লে,

সেই সময়ে আনন্দময়ীর কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দেরই বর্ণনা করিয়াছেন :—

মি'লে যত সুরবালা ডালা ভ'রে গাঁথে মালা
নগবালা তু'লে দেয় গলে।

আশুতোষের জীবের প্রতি দয়া-প্রকাশক কি অদ্ভুতই বর্ণনা :—

সেথা মন্দাকিনী-কূলে মণিময় বিল্বমূলে
তাপিতের জেনে মনোরথ,
মহাযোগী কল্পতরু ভাবেন ব্রহ্মাণ্ড-গুরু
পাতকীর নিস্তারের পথ।

নিষ্কাম শিবোপাসনায় নিজের কি অনুরাগ-ব্যঞ্জক লিপি :—

হে পিনাকি,

দৈত্য কত তোমা ভজে পূর্ণ হয়ে শৈবতেজে
বীর-দম্ভে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিল শাসন ;

দীনের হৃদয়-মাঝে　　সে বাসনা নাহি রাজে
　　সে সকল কিছুই না যাচে অকিঞ্চন।

হে শিব,

বড় সাধ প্রাণে জাগে　　ভূষিত বিভূতি-রাগে
　　ধরাময় শিবগুণ　করিব প্রচার;
প্রেমময় তব নামে　　প্রেমে তব গুণ গানে
　　বহাইব দুনয়নে সলিলের ধার।

প্রকৃতই তিনি শিবচিন্তায় আত্মহারা হইয়াছিলেন। "শঙ্করাচার্য্যে" এক স্থলে একটী গীত রচনা করিয়াছেন ঃ—

কি ব'লে তোমারে শিব ডাকিব বলহে তাই,
রবি শশী গ্রহ তারা ভ্রমিছে মহিমা গাই'।
ভাবিতে ভাবিতে তোমা আপনা হারায়ে যাই,
তোমারে হারালে নাথ হতাশে আকাশে চাই।
তোমার স্মরণে প্রাণে দ্বিগুণ শকতি পাই;
নামেতে শিহরে অঙ্গ তোমার তুলনা নাই।

কাশীর কোন অনাদিলিঙ্গ দর্শন করিতে গেলে সেই স্থানে বহুক্ষণ শিবের প্রণামাদি করিয়া পরে উন্মত্তের ন্যায় বম্ বম্ হর হর বলিয়া নৃত্য করিতেন এবং সে সময় বাহ্যজ্ঞান কিছুমাত্র থাকিত না। কাশীতে তাঁহার একটী নিয়ম ছিল। কাশীতে আসিয়া অবধি তিনি পুষ্পদন্তেশ্বর শিবের পূজা না করিয়া কখনও জলগ্রহণ করেন নাই। শরীর বিশেষ অসুস্থ হইলে অন্যের দ্বারা পূজা করাইয়া তবে নিজে জল গ্রহণ করিতেন। কোন বিশেষ কার্য্যগতিকে বিদেশে যাইতে হইলে পুষ্পদন্তেশ্বরের পূজার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। পুষ্পদন্তেশ্বরের পূজান্তে প্রতিদিন একটী করিয়া পয়সা নিয়মিতরূপে দিতেন। তিনি পুষ্পদন্তেশ্বরের পূজা এবং

নিজ বাটীতে নিত পূজাসকল করিয়া প্রতিদিন প্রায় দুইটার সময় ভোজন করিতেন। শিবারাধনায় এমনি প্রাণ ঢালিয়াছিলেন যে, তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বোধ হইত না। তিনি সেই হৃদ্‌গত ভাব শঙ্করাচার্য্য গ্রন্থে শঙ্করের উক্তিচ্ছলে লিখিয়াও গিয়াছেন, যথা ঃ—

ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে কি মা তার,
প্রাণে জাগে ধূর্জ্জটি যাহার?

সেই পুষ্পদন্তেশ্বর শিবের নিকটে প্রতিদিন পূজান্তে আধ ঘণ্টা করিয়া শিবনাম উচ্চারণ করতঃ এমন কাতরভাবে ডাকিতেন ও নৃত্য করিতেন, তাহা দেখিলে বোধ হইত, যেন শিবের কোন প্রমথ শাপভ্রষ্ট হইয়া ধরাতলে আসিয়া তাঁহার নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। সেই উচ্চৈঃস্বরে শিবনাম-গান এত মধুর লাগিত যে,পুষ্পদন্তেশ্বরের পাড়ার যাবৎ লোক অতি আনন্দের সহিত তাহা শ্রবণ করিত। এখন কেহ পুষ্পদন্তেশ্বরে উচ্চৈঃস্বরে শিবনাম করিলে ঐ পাড়ার সকলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া থাকে, "আহা! হরকুমারের ন্যায় শিবনাম আর শুনিতে পাইব না।"

শাস্ত্রী মহাশয় কাশীবাসাবধি পৈতৃক একটী বাণলিঙ্গ ও একটী পার্থিব লিঙ্গ এই দ্বিবিধ শিবলিঙ্গ পূজা প্রতিদিনই করিতেন। প্রতি বৎসরই শিবরাত্রিতে উপবাস করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করতঃ প্রতি প্রহরে শিবপূজা করিতেন এবং ঐ উপবাসদিনে প্রাতঃস্নান ও প্রাত্যহিক নিজ বৈধ কার্য্যসমুদায় সমাধা করিয়া যে যে স্থানে অনাদিলিঙ্গ আছেন, পূর্ব্বাহ্ণ হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সেই সেই লিঙ্গদর্শন, স্পর্শন ও সম্ভবমত পূজা করিয়া বাটীতে ফিরিতেন।

শাস্ত্রী মহাশয় একান্ত শিবভক্ত হইলেও রাম, কৃষ্ণ, সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতি এক ব্রহ্মেরই মূর্ত্তি, এই জ্ঞানে ঐ সকল মূর্ত্তিরই তিনি তুল্যভাবে

আরাধনা করিতেন। শঙ্করাচার্য্যের উক্তিচ্ছলে মনোগত ভাব তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যথা :—

নর কিবা নারী তাঁরে কে করে নির্ণয়!
দেয় ধরা যে ভাবে যে চায়;
এলোকেশী দিগম্বরী করে অসি ধরে
নেচে নেচে হেসে হেসে শবহৃদিপরে,
কখন সে কাতর জনায়
"মা ভৈ" "মা ভৈ" রবে দিতেছে অভয়;
কভু, নটবর পুরুষ-প্রবর,
বৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে,
কেঁদে কেঁদে রাধানাম ধোরে সেধে সেধে;
পাখী রাধাকৃষ্ণ বলে,
নামে যমুনা উথলে
প্রেমে শিলা যায় গ'লে;
কভু ব'সে সংযমী পুরুষ,
জটায় জাহ্নবী খেলে চন্দ্রকলা ভালে,
রুক্ষ কেশ, হীন বেশ, ভিক্ষুকের শেষ,
যেচে যেচে কিন্তু অকাতরে,
ইন্দ্রপদ, চন্দ্রপদ দিতেছে ভক্তেরে,
ধরে তাঁরে যে ভাবে যে স্মরে,
যেবা মন ডাকহ তাঁহারে।

অন্যস্থানে শঙ্করাচার্য্যের কৃষ্ণস্তুতিচ্ছলে লিখিয়াছেন :—

আমি অতি মূঢ়মতি,
তুমি অগতির গতি,

নাম হরি কৃপাবারি কর বিতরণ,
শ্মশানেতে তুমি কালী,
বৃন্দাবনে বনমালী,
কৈলাসে তুমি মোর দেব ত্রিলোচন !

সেই তরুণ-বয়সে তাঁহার কি গভীর জ্ঞান ! কি অমৃতোপম উপদেশ ! ক আত্ম-বিবেক ! তিনি শঙ্করাচার্য্যের উক্তিচ্ছলে একস্থলে লিখিয়াছেন :—

জননি গো—
বৃথা শোকে কি হেতু রোদন ?
ভাব মা গো কাহার মরণ ?
নয়ন মুদ্রিত ক'রে বুঝ ভাল ক'রে,
জীব-কুল "আমি" বলে যারে
নহে তাহা চক্ষুঃ কর্ণ নাসা,
নহে তাহা হস্তপদ শির,
নহে তাহা সমগ্র শরীর,
মা গো,

আমি ব'লে আখ্যা আছে যার,
নিত্যবস্তু ধ্বংস নাই তার,
যথা নর এক বস্ত্র করি পরিহার
বস্ত্রান্তর করে ব্যবহার,
সেইমত, পূর্ব্বকৃত পাপ-পুণ্য সহ
দেহ হ'তে দেহান্তরে "আমি" চ'লে যায়
অনলেতে পুড়ে শুধু মাটী ভস্ম হয়।

হরকুমার শাস্ত্রী যেরূপ সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার সেই সুন্দর দেহের

বর্ণনা করিয়া, লোকের নয়নের সম্মুখে অঙ্কিত করিয়া দিব, এরূপ কবিত্ব আমার নাই। তবে তাঁহার সেই মহাপুরুষোচিত শরীর, সুদীর্ঘ বাহু, প্রস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, সহাস্য বদন, সুন্দর নাসিকা, উজ্জ্বল প্রশস্ত চক্ষুঃ, কৃষ্ণবর্ণ সুচিক্কণ কেশ, নাতিস্থূল ন-হ্রস্ব দেহযষ্টি, চম্পকবর্ণ সদৃশ কান্তি যিনি একবার নয়নগোচর করিয়াছেন, তিনিই শাস্ত্রী মহাশয়ের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিবার পূর্ব্বে ঈষৎ হাস্য করিয়া এমন মধুর আলাপ করিতেন যে, একবার মাত্র তাঁহার সহিত যিনি আলাপ করিয়াছেন, তিনি পরম সন্তোষলাভ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার শরীরের এমনি একটী প্রভা ছিল যে, তাহা দেখিলে সকলেরই বোধ হইত যে, ইনি একটী অসাধারণ পুরুষ। তাঁহার হৃদয়ে এক ভাব ও বাহিরে অন্য ভাব ছিল না। সৌম্যমূর্ত্তিতে, মধুরালাপে, নম্রতায় ও সরলতায়, ভারতে শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় সকলেরই একান্ত স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অনুপম দেহ হইলেও সেই দেহের সৌষ্ঠবের জন্য কখন তিনি যত্ন করিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার পরিচ্ছদাড়ম্বর কিছুমাত্র ছিল না; শিখাধারী ব্রহ্মণ-পণ্ডিতোচিত বেশ ছিল। তিনি সামান্য পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয় ও এক জোড়া কে এম্ দাসের চটি ও একগাছি ছড়িমাত্র ব্যবহার করিতেন। বিলাসিতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। লোকে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটা না একটা নেশা করিয়া থাকে, শাস্ত্রী মহাশয় কখন কোন নেশাই করেন নাই, এমন কি, তিনি নস্য পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেন না এবং কখন আতর, গোলাপজল, লক্ষ্মীবিলাস কি জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন নাই। নশ্বর দেহের অসারতা তিনি এত বুঝিয়াছিলেন যে, নিজে শঙ্করাচার্য্যে

লিখিয়া তো গিয়াছেনই এবং মধ্যে মধ্যে মণিকর্ণিকায় বেড়াইতে গিয়া আনন্দের সহিত ইহা বলিতেন ঃ—

"নর নারী ধনী কি নিধন,
সমভাবে ধাতার সৃজন,
শ্মশানের কলেবর করিতে পোষণ !!"

এবং ইহাও আবৃত্তি করিতেন ঃ—

"বুঝেছি !—বুঝেছি !
রাজবেশ কাঙালে দেখাতে !
রাজ-ভূষা ললনা ভোলাতে !
সে সকল খ্যাতি আর লাম্পট্যের তরে !
সে সকল নারী-মাঝে প্রমোদ-আগারে !
নহে তাহা শ্মশানের তরে !!"

হস্তার উপদেশচ্ছলে শঙ্করাচার্য্যে লিখিয়াছেন, "বেশভূষা কল্লে যুবতীর মিত্র হওয়া যায় বটে, কিন্তু নিজের শত্রুতা করা হয়।"

হরকুমার শাস্ত্রীর স্বভাব বিচিত্র ! তিনি জীবনে কখন কাহাকেও কটু-বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তিনি এই জগদ্বিখ্যাত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র, সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত ও অসাধারণ কবি, রূপবান্, গুণবান্ ; রাজা, মহা-রাজ, কবি, মহাকবি, পণ্ডিত, অজ্ঞ, সাধারণের নিকট সমানভাবে আদরের পাত্র হইয়াও তাঁহার চিত্তে কখন দম্ভ, অভিমান স্থান পায় নাই। নিজের হৃদয়ের ভাব তিনি অনেক পরিমাণে শঙ্কাচার্য্যে হস্তার উপদেশচ্ছলে লিখিয়া গিয়াছেন। লিখন এই—"দম্ভ অভিমান প্রভৃতি জঘন্য পদার্থ সকল যদি তোমার শিক্ষার পরিণাম বিবেচনা কর, তা হ'লে বরং অশিক্ষিত থাকিও।" কি মধুর উপদেশ ! পরস্ত্রীকে তিনি চিরকাল মাতৃবৎ জ্ঞান করিতেন। রাস্তায় বেড়াইবার সময়ও তাঁহার দৃষ্টি একমাত্র পথের দিকে ভিন্ন অন্য

কোন দিকে নিক্ষিপ্ত হইত না। তিনি এ বিষয়ে নিজকৃত "নুরজাহান" নাটকে উপদেশচ্ছলে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন দেখা যায়। "নারীজ্ঞান নারীধ্যান নারী-মনোরথ। অধঃপাতে যেতে হ'লে অদ্বিতীয় পথ।"

শাস্ত্রী মহাশয় বাল্যকাল হইতেই যে অসাধারণ কবি, তাহা এই বাঙ্গালা পদ্যটীর রচনাভঙ্গীতেই অনুভব করা যাইতে পারে। একখানি অতি পুরাতন খাতায় তাঁহার লিখিত এই কবিতাটী দেখিতে পাইলাম। লিপির আঁকা-বাঁকা অক্ষর দৃষ্টে অনুমান করা যায়, ইহা তাঁহার বার তের বৎসর বয়সের রচনা। কারণ, তাঁহার এখনকার অক্ষর সে ভাবের হইলেও অতিপাকা। কবিতাটী এই—

প্রকৃতির ঝঙ্কার।

অনন্ত আকাশরূপ সুন্দরমন্দিরে,
শব্দময় মহাঘণ্টা বাজে উচ্চৈঃস্বরে।
সেই শব্দ ভীমনাদে মেঘমন্দ্রপ্রায়
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে ঘুরিয়া বেড়ায়;
সেই শব্দ সাগর-লহরে ভৃগহ্বরে,
সমীরে বারিদচ্যুত সলিল-শীকরে,
সেই শব্দ হুতাগ্নিতে হয়ে কম্পমান
ইন্দ্রাদি অমরবৃন্দে করিছে আহ্বান,
সেই শব্দ করি যত শব্দের আশ্লেষ
বহুমুখা প্রকৃতিতে করিছে প্রবেশ,
প্রতিধ্বনি হইতেছে অশেষ প্রকার,
কোথাও মধুরতান কোথাও চীৎকার।

সেই শব্দ কুঞ্জবনে কোকিলের গান,
সেই শব্দ সিন্ধু টোরী ইমন কল্যাণ,
সেই শব্দ মহারণ্যে মৃগেন্দ্র-গর্জ্জন,
সেই শব্দ অরবিন্দে ভ্রমর-গুঞ্জন।
সেই শব্দ বারণের বৃংহণ-বিকার,
সেই শব্দ বারিদের বিকৃত চীৎকার;
সেই শব্দ অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-টঙ্কার,
সেই শব্দ নারদের বীণার ঝঙ্কার,
সেই শব্দ প্রেয়সীর প্রিয়-সম্ভাষণ,
সেই শব্দ মনিবের কর্কশ বচন।
সেই শব্দ জ্ঞানগর্ভ গীতার আলাপ,
সেই শব্দ অর্থশূন্য পাগল-প্রলাপ,
সেই শব্দ "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ",
সেই শব্দ ঘোষে হনু হয়ে পার্থ-ধ্বজ।
সেই শব্দ শ্মশানেতে ক্রন্দনের রোল,
সেই শব্দ অন্তকালে হরি হরি বোল।
কঠোর যন্ত্রণাময় সংসার-সঙ্কটে
জীবেরে করিতে ত্রাণ রটে নিষ্কপটে।
সমস্বরে তন্ত্র মন্ত্র ঋক্ যজুঃ সাম,
সেই এক মূল শব্দ ওম্ ব্রহ্মনাম।
আপন আপন সুরে অনন্ত সংসার,
দিবানিশি সেই শব্দ করিছে ঝঙ্কার;
সে শব্দ ব্যতীত বিশ্বে শব্দান্তর নাই,
যে ভাবে যে শব্দ করে সেই শব্দ তাই।

পাখীর কূজন কিংবা ভৃঙ্গের গুঞ্জন,
বারিদের ধ্বনি কিংবা সিংহের গর্জ্জন।
স্থাবর-জঙ্গমে নিত্য যত শব্দ হয়,
সমস্ত শব্দই সেই ব্রহ্মনামময়।
বিনীত-মস্তকে ত্যজি' দম্ভ অহঙ্কার,
দিবানিশি সেই শব্দ করহ ঝঙ্কার।
আঁখি মুদে কাণ পেতে শুন সেই সুর,
সে সুরে স্ফুরিবে ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রচুর;
সেই সুরে সর্ব্বেন্দ্রিয় হইলে তন্ময়,
তবে তো হইবে তুমি সমাধিতে লয়।

শাস্ত্রী মহাশয় যে কেবল প্রধান বাঙ্গালা কবি ছিলেন, তাহা নহে, তিনি অসাধারণ সংস্কৃত-কবিও ছিলেন। তাঁহার রচিত "বৃন্দাবন-কল্প-লতিকা" নামক কাব্যগ্রন্থ শ্রবণ করিয়া বহু বিজ্ঞ লোক বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। কাব্যখানি প্রায় সমস্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি একবার কার্য্য-গতিকে দরভাঙ্গা গমন করিলে তথাকার রাজপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺বিশ্বনাথ ওঝা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং অনেক আলাপ-পরিচয়ের পরে শাস্ত্রী মহাশয় ঐ কাব্যের বহু শ্লোক তাঁহাদিগকে শুনান। ঐ সকল শ্লোক শ্রবণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় ৺বিশ্বনাথ ওঝা প্রভৃতি মিথিলা-দেশীয় রাজপণ্ডিতগণ কিরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের পত্রের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। পত্র এই——

"বঙ্গদেশান্তর্গত-ভাটপাড়া-নামক-গ্রাম-বাস্তব্যানাং মহামহোপাধ্যায়-শ্রীরাখালদাসশর্ম্মণাং মহানৈয়ায়িকানাং পুত্রেণ শ্রীহরকুমার-ভট্টাচার্য্যেণ সম্প্রতি রচিতং বৃন্দাবন-কল্প-লতিকাভিধানং কাব্যমস্মাভির্দ্দরভাঙ্গারাজ-ধান্যাং রচয়িতৃমুখান্নিশম্যাতীব হর্ষো লব্ধঃ। কবেরস্যানেকেষু সহিত্যাদি-

বিষয়েষু ব্যুৎপত্তিঃ কাব্যরচনা-নৈপুণ্যঞ্চাস্মাকং মনঃসু মহান্তং সন্তোষমজীজনদিতি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরঃ প্রার্থ্যতে যদেবংবিধঃ কবিশ্চিরং জীবন্ ভারতভূমিং ভূষয়ত্বিতি শম্।

মহামহোপাধ্যায়ঃ—
শ্রীবিশ্বনাথশর্ম্মা।
মীমাংসকঃ শ্রীচিত্রধরমিশ্রঃ।
শ্রীচন্দ্রশর্ম্মা কবিঃ।
১৫—২—৮৮ ইং।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরকুমার শাস্ত্রী গণিত-জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গণিতে তাঁহার কিরূপ অলৌকিক পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল এবং তাঁহার কিরূপ রচনা-কৌশল ছিল, তাহা তাঁহার রচিত মর্ম্মার্থ সহ এই দুইটী শ্লোক দ্বারা বিশেষ জানিতে পারা যায়। তিনি এই শ্লোকে রাজরাজেশ্বরী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু শকাব্দ (১৮২২) বাহির করিবার একটী অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন ঃ—

ইষ্টং বিংশহতঞ্চ বিশ্বসহিতং বাণেন যচ্ছেষিতং,
দ্বিষ্ঠং যুক্ত-বিযুক্ত-ভক্ত-গুণিতং কেনাথ দিগ্ভির্হতম্।
রামৈর্যুগ্ দ্বিশতীহতং দশশতী-সংশেষিতং পূর্ব্বত-
স্তন্নিঘ্নং দ্বিকরৈর্যুতং স্বরগমৎ শাকেঽত্র ভিক্টোরিয়া॥

মর্ম্মার্থ।—

তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা, সেই সংখ্যা লও,
কুড়ি দিয়া গুণ কর, তের যোগ দাও।

পাঁচ ভাগ ক'রে যাহা ভাগশেষ দেখ,
"গুণক" তাহার নাম, দুই স্থানে রাখ।
দুই স্থানে রেখে, তার এক স্থানে গিয়া,
তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা কর তাহা দিয়া,
যোগ কি বিয়োগ হোক্, হোক্ গুণভাগ,
যাহা তব অভিলাষ যাহে অনুরাগ।
মনোমত ক্রিয়া করি যে সংখ্যাটী পাও,
দশ দিয়া গুণ ক'রে তিন যোগ দাও।
দুইশত সংখ্যা দিয়া গুণ কর তায়,
গুণফল ভাগ কর সহস্র সংখ্যায়।
ভাগশেষ যাহা পাবে, "গুণ্য" নাম তার,
পূর্ব্বেই রেখেছ করে "গুণক" তাহার।
"গুণ্য" "গুণকেতে" গুণ করিয়া তখন
বাইশ তাহার সনে কর সংযোজন।
পাবে যাহা সেই শকে ধরাশূন্য করি
স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়া রাজরাজেশ্বরী॥

শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোকটীর দ্বারা রাজরাজেশ্বরী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু খৃষ্টাব্দ (১৯০১) বাহির করিবার কৌশল দেখাইয়াছেনঃ—

ইষ্টং খাভ্রখ-সংযুতং পথ-যমব্যস্তং খখেশান্বিতং,
খাকাশাশুগভাজিতং দ্বিগুণিতং যচ্ছেষিতং দৃগ্ হতম্।
খাকাশাগ্নি-সমাযুতং শশিযুতং যৎ তত্র খৃষ্টীয়কে,
বর্ষেঽস্মান্ সমপাস্য নাকমগাৎ ভিক্টোরিয়া ভূতলাৎ॥

মর্ম্মার্থ।

তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা সেই সংখ্যা লও,
তিনটী তাহার পার্শ্বে শূন্য যোগ দাও।
দুইশত বাদ দিয়া সংখ্যা থাকে যত,
তার সহ যোগ কর একাদশ শত।
পাঁচ শত দিয়া পুনঃ ভাগ কর তারে,
ভাগশেষ লও তার দুই গুণ ক'রে।
তাহারে দ্বিগুণ করি যাহা তুমি পাও,
তাহে তিনশত পুনঃ এক যোগ দাও।
যে খৃষ্টাব্দ পাবে তাহে ধরা শূন্য করি
স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়া রাজরাজেশ্বরী ॥*

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় সম্প্রতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাশীবাস নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ গ্রন্থে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রচিত যত সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহার তলদেশে যে মর্ম্মার্থ পদ্যাকারে প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ সকল বাঙ্গালা পদ্য এবং ঐ কাশীবাসগ্রন্থে প্রদর্শিত ন্যায়রত্ন মহাশয়কৃত সংস্কৃত অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের সমুদয় বাঙ্গালা হরকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ই করিয়া দেন, এবং এই অদ্বৈতবাদখণ্ডন-পরিশিষ্ট গ্রন্থখানি সম্প্রতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কাশীবাস গ্রন্থের সমালোচনাকালে হিতবাদী প্রভৃতি সকল পত্রিকাতেই বঙ্গভাষায় অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন-লিপির বিশেষ প্রশংসা প্রকাশিত হয়। একে তো দার্শনিক বাঙ্গালা, তাহাতে

---

* শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত মর্ম্মার্থ সহ এই শ্লোক দুইটী শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং আমাদের পরম মিত্র বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী মহারাষ্ট্রী সাধারণ যাবৎ পণ্ডিতের স্নেহের পাত্র উদ্‌ভটসাগর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন বি, এ, স্বকীয় উদ্‌ভটশ্লোকমালা পুস্তকে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমি সেই গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

ন্যায়শাস্ত্রমতে ভগবদ্গীতা ব্যাসসূত্র প্রভৃতির ব্যাখ্যা বাঙ্গালাভাষায় বুঝান যে কত কঠিন, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে সক্ষম।

শাস্ত্রী মহাশয় কাশীতে আসিয়া পাণ্ডিত্যে, কবিত্বে, রূপে, গুণে, মধুর-সম্ভাষণে, বিনয়ে কাশীর হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতে যাবৎ ভদ্রলোকের বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন।

কাহারও জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহার দোষ-গুণ উভয়ই সমান-ভাবে লেখা লেখকের কর্ত্তব্য। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের কোন দোষ কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই এবং লোকমুখেও কখন কোন দোষাংশ শ্রবণ করি নাই। তবে তাঁহার সময়ে সময়ে কার্য্যবিশেষে অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইত। ক্রোধের সময় তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইত, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিত এবং খুব চেঁচামেচি করিতেন। ৺কাশীর দেবনাথপুরার যে বাটীতে শাস্ত্রী মহাশয় বাস করিতেন, সেই বাটীর একটী গৃহে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে; অনবধান বশতঃ সেই শিবের ঘরে কাষ্ঠ, পাট, কাঠী দৈবাৎ রাখিলে শাস্ত্রী মহাশয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া এত চীৎকার করিতেন যে, বাটীর যাবৎ ব্যক্তি কম্পমান হইত। গয়লা দুগ্ধে অত্যন্ত জল দিতেছে; তাহাদিগকে ক্রোধ করিয়া এমন ধমকাইতেন যে, তাহারা দুই চারিদিনও অন্ততঃ ভয়ে ভাল দুগ্ধ দিয়া যাইত। যদি কোন বিশেষ কার্য্য গতিকে আমাদের উপর ক্রোধ করিতেন, পরক্ষণেই সেই ক্রোধের শান্তি হইয়া যাইত। তাঁহার ক্রোধপ্রকাশক বাক্যে আমরা অভিমান করিয়াছি, এই আশঙ্কায় কিয়ৎক্ষণ পরেই আমাদের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মধুর-সম্ভাষণ করিয়া বলিতেন, "ভাই, রাগ করিলে?" আমরা তাঁহার সেই সময়ের ভাব দেখিয়া অভিমানী হওয়া দূরের কথা, বিশেষ আনন্দিতই হইতাম। কাহারও প্রতি তাঁহার ক্রোধ দুই তিন দণ্ডকাল স্থায়ী হইত না। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ শাস্ত্রী মহাশয় পরিবারগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া

শাসনবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন; কাহারও কথা শুনিতেছেন না, কিন্তু তাহাতে ন্যায়রত্ন মহাশয় বিরক্ত হইতেছেন, ইহা জানিতে পারিলে শাস্ত্রী মহাশয় তৎক্ষণাৎ সেই ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হইতেন।

হরকুমার শাস্ত্রী একান্ত পিতৃভক্ত হইলেও একটী মাত্র কার্য্যে তিনি পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্নীর অত্যন্ত মৃতবৎসা-দোষ ঘটায় ঐ মৃতবৎসা-দোষ-শান্তি-কামনায় ন্যায়রত্ন মহাশয় বহুবিধ বৈধকার্য্য করাইয়াও যখন হতাশ হইলেন, তখন ন্যায়রত্ন মহাশয় নিতান্ত উদ্বিগ্ন হন। উদ্বিগ্ন হইবার কথাও বটে; হরকুমার শাস্ত্রী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। তাঁহার ঐরূপ অপত্যবিভ্রাট্ দেখিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবেন? এজন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় গত বৎসর ফাল্গুন মাসে হরকুমার শাস্ত্রীর পুনর্ব্বার আর একটী বিবাহ দিবার মানস করেন, এবং নিজের অভিপ্রায় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু হরকুমার শাস্ত্রী সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হন নাই। তাহাতে ন্যায়রত্ন মহাশয় বারংবার ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বিশেষ ক্ষুণ্নও হইয়াছিলেন। অসাধারণ পিতৃভক্ত হরকুমার শাস্ত্রী পিতার এই অনুরোধটী রক্ষা করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেন, এবং বলিতেন, "বাবার ঐ অনুমতিটী আমি পালন করিতে পারিলাম না। আমার কর্ণে যেন কেহ বলিয়া দিতেছে যে, ইহাতে মহা অনিষ্ট হইবে।" তিনি যে উভয় পত্নীর প্রতিপালনভয়ে ঐ বিবাহে বিরত হইয়াছিলেন, ইহা সম্ভব নহে, তিনি পিতার একমাত্র পুত্র এবং তাঁহার পিতা অসম্পন্নও নহেন। এক্ষণে বুঝিলাম, শাস্ত্রী মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিলে এই সর্ব্বনাশের উপর কি বিপদ্ই উপস্থিত হইত!

শাস্ত্রী মহাশয় কি ধনে কি মানে কি বংশগৌরবে সকল বিষয়েই

বিশেষ সুখী ছিলেন, কিন্তু একটী বিষয়ে তিনি বড়ই অসুখী ছিলেন; তাঁহার শরীর প্রায়ই অসুস্থ হইত। হয় পেটের গোলমাল, না হয় মস্তিষ্ক-দোষ, না হয় হৃদয়দৌর্ব্বল্য একটা না একটা পীড়া তাঁহার থাকিতই। দিবাভাগে আহার করিয়া রাত্রে মাত্র একটুকু দুগ্ধ খাইয়াই কালযাপন করিতেন। যদি দৈবাৎ কোন দিন রাত্রে দুই চারিখানি লুচি কি রুটী খাইতেন, তবে তাহার পরদিন দিবসে আহার করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা হইত না। কিন্তু ঐ সকল শারীরিক পীড়া সত্ত্বেও শাস্ত্রী মহাশয়ের মানসিক উৎসাহের কিছুমাত্র হানি হয় নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের চারি পাঁচটী পুত্র-কন্যা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সন্তানগুলি কেহ জন্মের একদিন, কেহ দুই দিন, কেহ বা দশ মাস পর্য্যন্ত থাকিয়া কাশী-লাভ করিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় যখন ৺কাশীলাভ করেন, তখন তাঁহার পত্নী নয় মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; আশা ছিল—যদি একটী পুত্র হইয়া বাঁচিয়া থাকে; কিন্তু "দৈবী বিচিত্রা গতিঃ" তাঁহার কাশীলাভের এক মাস পরে একটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়; সে কন্যাটী মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান।

বৃদ্ধ পিতাকে ও আত্মীয়-স্বজনকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া, একটী সুসন্তান ভারতমাতার কোল শূন্য করিয়া, ভারতবাসীকে চক্ষের জলে ভাসাইয়া, ভারতের একটী উজ্জ্বলরত্ন অন্তর্হিত হইল! একটী প্রস্ফুটিত কুসুম সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়া অকালে বৃন্তচ্যুত হইল!—বসন্ত-রোগাক্রান্ত হইয়া ১৩১৩ সালের ৫ই বৈশাখ তারিখে বারাণসীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটে ৺গঙ্গাতট নারায়ণক্ষেত্রে সজ্ঞানে হরকুমার শাস্ত্রী দেহত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণলাভ করিলেন! কাশীতে হাহাকার উত্থিত হইয়া সেই কল্লোল দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইল। সেই নিদারুণ বার্ত্তা যাহার কর্ণ-গোচর হইতে লাগিল, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, সকলেই নিস্তব্ধ—সকলেই মর্ম্মাহত! বিষাদ-সাগর উথলিয়া ভারতকে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ ও

কাশীকে যেন গ্রাস করিল; সকলেরই মুখে একটী মাত্র কথা এই "হ'লো কি!" বাস্তবিকই "হ'লো কি!" শাস্ত্রী মহাশয় একান্ত কাশীভক্ত ছিলেন, তাঁহার দেশে অর্থাৎ ভাটপাড়ায় তাঁহার দেশে অর্থাৎ ভাটপাড়ায় পতিতপাবনী সুরধুনীর তীরে সুন্দর নব-নির্ম্মিত দ্বিতল ভবন, আত্মীয়স্বজন, বিষয়, শিষ্যবর্গ সকল থাকিলেও তিনি কাশীতে থাকিবার জন্যই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। হাতুয়ার রাজ-সংসার হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয় পূর্ব্বস্থিরীকৃত যে শালিয়ানা ৬০০৲ ছয় শত টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন; বিন্ধ্যাচলে শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুরের উপনয়নের সময় ন্যায়রত্ন মহাশয় ও হরকুমার শাস্ত্রী মহাশয় তথায় আহুত হইয়া গমন করিলে পর শ্রীমতী মহারাণী মহোদয়ার নিকট শাস্ত্রী মহাশয় নিজের কাশীবাসের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে শ্রীমতী মহারাণী মহোদয়া তৎক্ষণাৎ সুদক্ষ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বাবুর দ্বারায় জানান যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা পাইতেছেন, আপনিও কাশীবাস করিলে যাবজ্জীবন তাহাই পাইবেন। ঐ বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের আনন্দের সীমা ছিল না। কাশীবাস করিবার বাসনা তাঁহার সফল হইল; তিনি কাশীতে সুখে বাস করিবেন, পৈতৃক সম্পত্তি ও শিষ্যবর্গের দ্বারা সুখে কালযাপন করিবেন, বৃদ্ধ পিতার সেবা করিবেন—না—এ "হ'লো কি?"

শাস্ত্রী মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পর অনেক ভাল ভাল বিদ্বান্ ও শিক্ষিত অভিজ্ঞ বহুধনী ব্যক্তি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এবং আমাদিগকে এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন যে, হায়! হরকুমার শাস্ত্রীর সহিত আমার একবারমাত্র আলাপ কেন হইয়াছিল? ইত্যাদি। ঐ সকল পত্রের মধ্যে দুইখানি মাত্র পত্র এবং দুই একটী শ্লোক এ স্থলে প্রদত্ত হইল।

টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বিশেষ অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়

চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, মহোদয় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা অবিকল এই ঃ—

"শ্রীহরিঃ শরণং

বরাহনগর, ১৩১৩ সাল, ৩০শে বৈশাখ,

পরমপূজনীয় মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

বৃদ্ধকালে শান্তি-প্রত্যাশায় স্থিরচিত্তে ভগবচ্চিন্তায় জীবন-সন্ধ্যা অতিবাহিতকরণার্থ কাশীধামে ভগবৎ-বিশ্বেশ্বর-সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়াও মহাশয় যে দুঃসহ অশনিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। যে দিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্রে স্বর্গগত হরকুমার শাস্ত্রিমহাশয়ের অকালে পরলোক-গমনের সংবাদ পাঠ করিলাম, সে দিন যে মনোবেদনা পাইয়াছিলাম, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে। বিশেষতঃ অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মদীয় ভবনে পদ-ধূলি প্রদান করায় তাঁহার ঋষিকুমার সদৃশ তেজঃপুঞ্জ সৌম্যমূর্ত্তিদর্শনে এবং আলাপ করিয়া দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি উপলব্ধি করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলাম। এত শীঘ্র যে তাঁহার পুনর্দ্দর্শনে বঞ্চিত হইব, ইহা ভাবি নাই। সুতরাং তজ্জন্য বড়ই মনস্তাপ পাইয়াছি। তিনি পরিণত বয়সে যে মহামহোপাধ্যায় পিতার উপযুক্ত পুত্রস্বরূপে জনসমাজে বংশানুরূপ যশস্বী হইতেন, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এইক্ষণ একমাত্র কৃতী পুত্রের অভাবে আপনার যে নিদারুণ অবস্থা ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে ভাবিয়াও মনে অপরিসীম ক্লেশ অনুভব করিতেছি। তবে অশনিপাতধারণে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গই একমাত্র অধিকারী, এই ধারণায় আপনার শোক-সহিষ্ণুতা প্রতি বিশ্বাস আছে। আপনার ন্যায় শিবতুল্য ব্যক্তিকে প্রবোধ দেওয়া মাদৃশ ব্যক্তির সাধ্যাতীত। আশা করি, স্থিরচিত্তসংযমের

বলে আপনি নিজেই শান্তিলাভ করিবেন। এক্ষণে আমার শারীরিক ও মানসিক কুশল যত দূর হওয়া সম্ভব, তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইব।

প্রণত শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।”

সর্ব্বদর্শনমর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞতম শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি এল, মহোদয় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি ঃ—

“শ্রীশ্রীহরিঃ। কলিকাতা

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩১৩ সাল।

শ্রীচরণকমলেষু

আপনার পুত্র হরকুমার পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আমার একবারমাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে আমার গুরুদেবের প্রমুখাৎ তাঁহার কতক পরিচয় অবগত ছিলাম। সাক্ষাতে তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার অভাবে যে কেবল আপনার মর্ম্মচ্ছেদ হইয়াছে, ইহা নহে, সংস্কৃত বিদ্যা ও দার্শনিক গবেষণারও প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। এরূপ পুত্রের অদর্শনে আপনার ন্যায় পণ্ডিতও কাতর হইবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? ভগবান্ আপনাকে শোকে শান্তি প্রদান করুন্। কাশীবাস গ্রন্থের পরিশিষ্ট হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আমি সযত্নে পাঠ করিয়াছি। আমার গ্রন্থের ভবিষ্যৎ সংস্করণে ঐ সকল বিষয়ের যথাযোগ্য ব্যবহার করিব। ইতি

প্রণত

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।”

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট শাস্ত্রি-মহাশয়ের দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া মহারাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর “আহা! সেই ছেলেটী, আহা! সেই ছেলেটী” এই কথা মাত্র বলিয়া অর্দ্ধদণ্ড-

কাল নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের সর্ব্বপ্রধান এবং পশ্চিম-দেশের রাজা মহারাজ ধনীলোকের সর্ব্বাধিক মান্য কাশীবাসী মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার মিশ্র মহাশয়ের নিকট কোন কার্য্যগতিকে শাস্ত্রী মহাশয়ের পরম মিত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় গমন করিলে শাস্ত্রিমহাশয়ের দেহাত্যয় জন্য বহু-আক্ষেপ করিয়া দুই তিন দণ্ডকাল তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "হরকুমারের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত ছেলে, এক্ষণ কি বাঙ্গালা কি হিন্দুস্থান কোন স্থানেই দেখিতে পাই না।" সেই সময় তথায় বহুপণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। মিশ্র মহাশয় আরও বলিলেন, "আজ হরকুমারের শোকে সমস্ত হিন্দুস্থান হাহাকার করিতেছে।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রিয়তমছাত্র কাশীভাস্কর পাঠশালার প্রধান ন্যায়-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়ের আক্ষেপ-উক্তি ঃ—

লব্ধ্বা স্ব তুফলং ত্রিলোকগুরবে দত্ত্বা তদংশার্পণং,
নো কৃত্বা সুহৃদে কদাপি ন মুদা যেনৈতদাস্বাদিতম্।
অস্মাকং যশসে স্থিতশ্চিরদিনং যস্য প্রয়াসো মহান্,
তচ্চিত্রং গুরুপুত্রমেতমতুলং হিত্বাপ্যি জীবামি যৎ॥

কাব্যশাস্ত্রে শাস্ত্রিমহাশয় কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত এবং তাঁহার পরম প্রিয় অনুগত, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র, সুকবি শ্রীযুক্ত হরিহর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রি-মহাশয়ের বিয়োগে ব্যথিত হইয়া যে আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন, তাহা এই ঃ—

কীর্ত্ত্যা সার্দ্ধমশেষসদ্‌গুণভৃতো যস্যোপদেশেন মে,
নির্ম্মাণায় কিয়ৎ ক্ষমত্বমভবদ্‌গদ্যস্য পদ্যস্য চ।
যঃ স্নেহং কুরুতে স্ম মামনুগতং মত্বা কনিষ্ঠোপমং,
নো দৃষ্ট্বাস্য সহাস্যমাস্যমধুনা পশ্যামি শূন্যং জগৎ॥

শাস্ত্রিমহাশয়ের বিয়োগে তাঁহার ভালবাসার পাত্র সঙ্গীগণ প্রকৃতই

জগৎকে শূন্য দেখিতেছেন। যাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়া লোকে শোক সংবরণ করিতে পারিতেছে না, সেই গুণনিধির নিত্যসহচরগণ যে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র, বাঙ্গালার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় শাস্ত্রিমহাশয়ের অকালে কাশীপ্রাপ্তি হওয়ায় একান্ত দুঃখিত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী পাঠাইয়াছেন :—

সোঽন্বর্থনামা বপুষা কুমারো,
গুণৈর্হরো বা হর এব বালঃ।
হরোঽহরৎ সর্ব্বগুণাকরং তং,
হা হা জগৎশূন্যমিবাবলোকে ॥
মৃতো হরকুমারো সাবমৃতত্বমবাপ্তবান্।
ইতি নিশ্চিত্য মচ্চিত্তং স্থিরত্বমবলম্বতে ॥

নব্য প্রাচীনন্যায়ের প্রধানরূপে উত্তীর্ণ, বহুবিদেশীয় বিদ্যার্থীকে অন্নদান পূর্ব্বক প্রায় বিংশতি বৎসর অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী, ভাটপাড়ার বশিষ্ঠবংশের সমুজ্জ্বল রত্ন-স্বরূপ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ন্যায়তর্কতীর্থ মহোদয় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"অসংখ্য-সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি-পূর্ব্বকং নিবেদনমেতৎ

ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কালের কুটিল স্বভাব দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া আছি। বাঁচিতেও ইচ্ছা করে না, মরিবার উদ্দেশে যে হাত-পা ছাড়িয়া দিয়াছি, তাহাও নহে। আপনার ও আপনার ধর্ম্মোজ্জ্বল তীব্র প্রতিভার আমরা চিরকিঙ্কর। * * * এ বর্ষটা সর্ব্বপ্রকারে দুর্ব্বৎসর। আমি পিতৃহীন হইলাম; এবং একটী বিশেষ অনিষ্টপাতে বংশ শ্রীহীন হইয়া যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ অসম্ভব। সে সুরকুমারোচিত সদাকার, সর্ব্বতো-

বিসারিণী প্রতিভা, যৌবনে ইন্দ্রিয়জয়, গভীর ভক্তিরসপ্লুতা ধর্ম্মবৃত্তি, তাদৃশ পিতৃ-ভক্তি আর কি আমাদিগের বংশে ঘটিবে? ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমার বুদ্ধি এই কথা বলে যে, এই আকস্মিক দুর্ব্বিপাকে আপনার অপেক্ষায় আমাদিগের বংশের বেশী ক্ষতি হইয়াছে। আপনার ক্ষতি দুই দশ বৎসরের জন্য, বংশের ক্ষতি ধারাবাহিকরূপে। আমি বোধ করি, হরকুমার ভায়ার আসন্নমৃত্যুকালে কাশীস্থ সজ্জন-মণ্ডলী এইরূপে আক্ষেপ করিয়াছিলেন,—

অমৃতজনকদারং সন্মনঃ-কণ্ঠহারং,
মুনিসুতবদুদারং যাতসৌজন্যপারম্।
কৃতশিবপদসারং শঙ্করো নির্ব্বিচারং,
হরতি হরকুমারং হন্ত সাক্ষাৎ কুমারম্॥

পশ্চিমদেশীয় সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক, চিকিৎসা-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ব্যুৎপন্ন, ব্যাকরণ-কাব্য-অলঙ্কারে বিশেষ অভিজ্ঞ, ন্যায়শাস্ত্রে সুপ্রবিষ্ট গুরুদেব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র-সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত উমাচরণ কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহোদয় শাস্ত্রিমহাশয়ের অকাল-বিয়োগে শোকার্ত্ত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিয়াছেন :—

পুরারিপুপুরবাসং পূর্ণপৃথ্বীবিলাসং,
চিরপরমপদাশং সর্ব্ববিদ্যাবিকাশম্।
বিজিতবিষয়পাশং স্বান্তশান্তিপ্রকাশং,
ভ্রমভুজগবিনাশং নৌমি রাখালদাসম্॥
হরো হরকুমারং যৎ চিরায় হরকিঙ্করম্।
জহার তস্য বীজত্ব ধ্রুবমিত্যনুমীয়তে॥
কৌমারেঽপি কবিত্বকীর্ত্তিকৃতিতাং কান্তিং কুমারোপমাৎ
বিক্রান্তিং বিবিধাং রতিং ভবশিবা-সংসেবনে সন্ততাম্।

জ্ঞাত্বা স্নেহপরো হরোঽহরদহো মত্বা কুমারং নিজং,
কৈলাসে কিল তস্য বাস উচিতঃ কস্মাৎ কুমারঃ ক্ষিতৌ॥

শাস্ত্রী মহাশয় যখন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন, তখন কাশীতে অনেকেরই বসন্তরোগ হইতেছিল, প্রায় বহুলোকই আরোগ্য লাভ করিতেছিল। তাঁহার সেই বসন্তরোগ দেখা দিয়াছে মাত্র, ভয়ের বিশেষ কারণ নাই; তাঁহার আত্মীয়গণ তত উদ্বিগ্নও হন নাই; কিন্তু ঐ যোগী পুরুষ কর্ম্মক্ষয় করিবার জন্য দেহ ধারণ করিয়াছেন মাত্র, চিরকাল বিশ্বনাথের নিকট নিজের ভবমোচন কামনা করিয়া আসিয়াছেন। ৺বিশ্বনাথ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, ইহা বোধ হয় শাস্ত্রী মহাশয় রোগের প্রথমেই জানিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যখন কাহারও প্রিয়তমা যুবতী ভার্য্যা, কাহারও একমাত্র পুত্র কাশীলাভ করিলে, তাহাদের আত্মীয়গণ যখন হাহাকার করিতেন, সেই সকল ঘটনা শাস্ত্রী মহাশয়ের কোন বন্ধু তাঁহার নিকট গল্প করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে, তিনি তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্র দুঃখ প্রকাশ না করিয়া বরং অধিকতর আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং বলিতেন, "ভাই! যাঁহারা কাশীলাভ করিতেছেন, তাঁহারা যোগীপুরুষ। তাঁহাদের আজ চিরদিনের জন্য দুঃখের নাশ হইল। এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি আছে? অতএব ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করিও না। উহাদের আত্মীয়গণের কষ্ট হইয়াছে; সে কষ্ট কয়দিন, দশ কি কুড়ি বৎসর বৈ ত নয়? দেশে মরিলে শোক করিতে পার, কিন্তু এই কাশীধামে দেহত্যাগ করিয়া যাঁহারা নির্ব্বাণলাভ করিবেন, তাঁহাদের জন্য শোক করিও না, বরং তাঁহাদের সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবে।" শাস্ত্রী মহাশয়ের তৎকালীন সেই সকল কথা দ্বারা বোধ হইত, উপদেশ দিতেছেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালীন বিচিত্রভাব দেখিয়া বুঝিয়াছি, তিনি ঐ সকল কথা অন্তরের সহিতই বলিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগী 'যদি না বাঁচি,'

এই আশঙ্কায় আত্মীয়-স্বজন ধন-রত্ন স্মরণ করিয়া এতই ব্যাকুল হইয়া উঠে যে, সেই ব্যাকুলতা দর্শনে রোগীর আত্মীয়গণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে থাকে, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাব বিচিত্র। তিনি ঐ কঠিন রোগ হইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইব না, ইহা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াও এই সম্পৎ, যশঃ, খ্যাতি রাজা-মহারাজ হইতে পণ্ডিত সাধারণ লোকের পরম সমাদরকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া অকাল-মৃত্যু জন্য কিছুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই, এবং মৃত্যুকালীন তাঁহার বিন্দুমাত্র বিষাদচিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। ঐ বসন্ত রোগের চিহ্ন দেখিবামাত্র তাঁহার নিত্যসহচর এমন কি, দূরদেশে যাইতে হইলে যাহাদের অন্যতরকে সঙ্গে না লইয়া যাইতেন না, সেই একান্ত প্রিয় প্রাণের বন্ধু শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন ও দক্ষিণাচরণ তর্কনিধিকে বলিলেন, "দেখ ভ্রাতৃদ্বয়! আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব, এরূপ আশা করি না। তোমরা বাবাকে এ সকল কথা জানাইও না; আমি একটী শ্লোক রচনা করিয়াছি, ঐ শ্লোকটী ৺জাহ্নবীতীরে মরণপ্রাকালে আমাকে শুনাইবে। সে সময় বিশেষ চৈতন্য না থাকে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবে।" এই কথা শুনিবামাত্র "দাদা মহাশয়, বলেন কি! আপনার কি হইয়াছে?" এইরূপ বলিয়া প্রতিবাদ করিলে, তিনি বলিলেন, "ভাই! আমার কথায় প্রতিবাদ করিও না। যদি আরোগ্যলাভ করি, ভালই; কিন্তু যদি দেহ না টেকে, তবে তোমরা এ অনুরোধটী লঙ্ঘন করিও না। আমি তোমাদিগকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতাম; কিন্তু অদ্য নির্দ্দয়ভাবে তোমাদিগকে বলিতেছি, যদি তোমরা আমাকে ভালবাসিয়া থাক, তবে আমাকে ৺গঙ্গাতীরে শোয়াইয়া এই শ্লোকটী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।" শ্লোকটী এই—

পূর্ব্বস্মিন্নথবাত্র জন্মনি কৃতং দুষ্কর্ম্ম যদ্‌যন্ময়া,
প্রায়শ্চিত্তবরেণ্য-বৈধমরণাত্তৎপাপনাশাশয়া।

নাথ ত্বন্নগরে তব প্রিয়তমাতীরে শয়ানোঽস্ম্যহং,
যত্তে যুক্তমতঃপরং কুরু তথা ভো বিশ্ববন্ধো বিভো ॥

সেই সময় ঐ শ্লোকের মর্ম্মার্থও লেখাইয়া দেন :—

যদি পাপ ক’রে থাকি জন্ম-জন্মান্তরে
কিংবা জ’ন্মে থাকে যদি এ জন্ম-ভিতরে।
মৃত্যু প্রায়শ্চিত্ত সেই পাপ নাশিবারে
প্রধান বলিয়া গণ্য করে শাস্ত্রকারে।
যে স্থান কৈলাস হ’তে তব প্রিয়তর,
যে নারীকে শিরে ধ’রে হ’লে গঙ্গাধর।
তব দাস আজ বৈধ মরণের তরে
শয়ন করেছে সেই কাশীগঙ্গাতীরে।
অতঃপর যাহা ইচ্ছা হয় শিব তব,
কিঙ্করে তাহাই কর হে দীন-বান্ধব ॥

শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা রচনার এই শেষ !

এই মর্ম্মার্থে তাঁহার কথিত ‘যদি’ শব্দের দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি যে, তিনি জীবনে কখনও জ্ঞানকৃত কোন পাপই করেন নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের রোগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলে তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, “ভাই ! তোমাদিগকে আরও একটী কথা বলিয়া যাইতেছি, অন্যথা করিবে না। তোমরা বাবার প্রিয় শিষ্য ও ছাত্র, তোমরা কিছু-দিনের জন্য বাবার নিকট সর্ব্বদা থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবে, এবং যাহাতে শাস্ত্রচিন্তা করেন,সে বিষয়ে উদ্যোগী হইবে। আমি জানি,শাস্ত্রচিন্তা করিলে বাবার শোক-মোহাদি কিছুই থাকে না।” এবং সেই সময় ইহাও বলিলেন, “আমি যে বাঙ্গালা রচনা করিতে শিখিয়াছিলাম, এতদিনের পর সার্থক হইয়াছে ; যে হেতু, বাবার জীবনচরিত তো সম্পন্ন করিয়াছি।”

শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতৃভক্তি অনুপম! কিসে পিতার সুদীর্ঘজীবন হইবে, কিসে তাঁহার যশঃ বালক সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইবে, এই চিন্তাতেই তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলেন। কলিকাতায় যাইলে ভাল মকরধ্বজ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন; পিতার শরীর কিসে সুস্থ থাকিবে, দিন-রাতই এই ভাবনা করিতেন। হরকুমার শাস্ত্রীর যে সময়ে রোগের অতি-বৃদ্ধি হইল, সেই সময় ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি নিয়মী হইয়া অর্থাৎ উপবাস-ব্রতাবলম্বন করিয়া, গঙ্গাতীরস্থিত শ্রীশীতলা দেবীর মন্দিরে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করতঃ দুই দিবস ঐ দেবীর আরাধনা করেন। দ্বিতীয়-দিবসীয় নিশাবসান হইলে ইংরাজী ৫ ঘটিকা সময়ে বাটী প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন যে, হরকুমার সমস্ত রজনীর মধ্যে একবারও ঔষধ সেবন ও দুগ্ধ পান করেন নাই, তখন তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ শ্বাসের উপক্রম হইয়াছে; ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহা জানিতে না পারায় অতি আক্ষিপ্ত হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন, "বাবা হরকুমার! তোমার জন্য দুই দিন আহার-নিদ্রা-বর্জ্জিত হইয়া শীতলার ঘরে ভূমি-শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া কতই দুঃখ পাইলাম, তুমি যৎকিঞ্চিৎ ক্লেশ পাইবার ভয়ে সমস্ত রাত্রিমধ্যে একবার একবিন্দু ঔষধ সেবন ও দুগ্ধ পান কর নাই! এরূপ কার্য্য করাই যদি তোমার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে আমি বাটী হইতে চলিলাম, আর আসিব না।" হরকুমার পিতার এই আক্ষেপ-উক্তি শুনিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখপানে সজল-নয়নে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন মাত্র, কোন কথা কহিবার ক্ষমতা হইল না। সেই অবধি এক গোঁদল আধ গোঁদল দুগ্ধ অতি ক্লেশে পান করিতে লাগিলেন, এবং ঔষধটী আদার রস মিশ্রিত থাকায় অতি কষ্ট হইলেও মধ্যে মধ্যে তাহাও সেবন করিতে লাগিলেন; গলার ভিতরে বসন্ত-ক্ষত হওয়ায় গলাধঃকরণ-সময়ে উত্তান-চক্ষু ও শিরঃ-কম্পন করিয়া ঔষধ উদরস্থ করিতে লাগিলেন। সেইক্ষণ হইতে আর একবারের জন্যও ঐ ঔষধাদি-সেবনে

অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই ; চারিদণ্ড বেলা পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যবহার করিলেন। সেই সময় তথায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই কাকুস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আহা! এই অবস্থাতেও হরকুমার পিতার আক্ষেপ মেটাইবার জন্য কি ক্লেশেই ঔষধ গলাধঃকরণ করিতেছে! ধন্য হরকুমার! ধন্য পিতৃভক্তি! ধন্য পিতৃ-আজ্ঞাপালনে দৃঢ়তা !!" সেই সময় তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ইহাও বলিতে লাগিলেন, "আজ অবধি পিতৃ-আজ্ঞা-পালনে হরকুমার একমাত্র আদর্শস্থল হইল।" পরে শ্বাসবৃদ্ধি হওয়ায় সেই অবস্থা দৃষ্টি করিয়া অচিরকালমধ্যে হরকুমারের জীবনান্ত হইবে, ইহা অবধারণ করতঃ শাস্ত্রে পরম-শ্রদ্ধাবান্, একান্ত কাশী ও গঙ্গা-ভক্ত, অসাধারণ শিবভক্ত শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন, "যাও বাবা, শিবে মেশ গে যাও, এ কর্ম্মভূমি তোমার থাকিবার স্থান নহে। বহু শিবারাধনা করিয়া তোমাকে লাভ করায় এবং তোমার অসামান্য অশেষ গুণ ও শিবভক্তি দর্শন করিয়া তোমাকে শিবাংশ বলিয়া বুঝিতাম ; যাও বাবা, শিবে মেশ গে যাও।" এই কথা বলিয়াই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনসর্ব্বস্ব, নয়নানন্দকর, চিত্তানন্দদায়ক, অশেষ-গুণাকর, শিবভক্তিপরায়ণ, সুবর্ণপুত্তলিকাস্বরূপ, একমাত্র পুত্র হরকুমারকে ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া বারাণসীস্থিত ভাগীরথীগর্ভে যাত্রা করাইলেন ; এবং সেই সময় ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বয়ং নিজ পেটরা হইতে নূতন বস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন ; উত্তরকালে সুবর্ণখণ্ড লাগিবে, ইহা বিবেচনা করিয়া সুবর্ণখণ্ডও বাহির করিয়া দিলেন। অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! প্রাচীন পিতা একমাত্র অঞ্চলের নিধিকে অকাতরে ৺গঙ্গাযাত্রা করাইলেন! ধন্য পিতা! ধন্য পুত্রস্নেহ! ইহকালে পুত্রের নিয়ত সুখচিন্তা করিয়া পরকালেও তাঁহাকে পূর্ণ সুখী করিবার জন্য যে ব্যস্ততা, তাহা কেবল মহাপুরুষ ন্যায়রত্নমহাশয়েই দৃষ্টিগোচর হইল! কাশী হাহাকার-রবে পরিপূর্ণ

হইয়া গেল! দশাশ্বমেধ-ঘাট লোকে লোকারণ্য! সকলেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন; সকলেরই দীর্ঘ-নিশ্বাস; সকলেরই মুখে হাহাকার ধ্বনি; সকলেরই নয়নে দর দর অশ্রুধারা! সেই কাশীর দশাশ্বমেধ-ঘাটে ৺গঙ্গাগর্ভে দুই দণ্ডকাল থাকিয়া, উচ্ছ্বসিত শোকসাগরোত্থিত হাহাকারধ্বনির সহিত শাস্ত্রী মহাশয় সজ্ঞানে কলেবর ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণলাভ করিলেন!!

যস্তারুণ্যগতোঽপি কোবিদগণং বৃদ্ধং যুবানং নৃপং,
সর্ব্বং মর্ত্ত্যমতোষয়ৎ তদখিলস্নেহাস্পদং চাভবৎ।
কৈবল্যং লভতে স্ম শম্ভুনগরী-গঙ্গাস্থিতো যো মৃতঃ,
সৌভাগ্যেষু যশস্বিনোঽস্য সমতা কুত্রাপি কিং দৃশ্যতে॥

উপসংহার।

শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিতের শেষে পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও অদ্ভুত চরিত্র কিছু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন-চরিত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় অসঙ্গত হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস ; এবং এ সময় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অবস্থা জানিতে অনেকের ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে, তাঁহাদের ঔৎসুক্য-নিবারণের জন্যও কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম।

শাস্ত্রী মহাশয়কে যখন ৺গঙ্গাযাত্রা করান হইল, তখন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ব্যাপার পূর্ব্বেই লিখিয়াছি ; তাহার পর তাঁহার অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার কিছু লিখিতেছি।

ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বয়ং ৺গঙ্গাযাত্রা করাইয়া উপরে উঠিলেন, এবং উপরে গিয়াই বলিলেন, "কে আছ, তোমরা সত্বর পূজার উদ্যোগ করিয়া দাও, আমি পূজা করিব। হরকুমার আর অধিক কাল বাঁচিবে না ; শিবপূজা ও নারায়ণপূজায় ব্যাঘাত ঘটিবে।" এই বলিয়াই অবিলম্বে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া পূজায় বসিলেন এবং সেই সময় শাস্ত্রী মহাশয়ের গর্ভবতী পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমা, তোমাকে এখনই দুগ্ধ খাইতে হইবে ; হরকুমারের জীবনান্তে তোমাকে উপবাস করিতে হইবে, তাহা হইলে তোমার গর্ভটীর বিঘ্ন হইবার সম্ভব।" এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া সেই সময় বধূমাতাকে প্রায় তিন পোয়া দুগ্ধ খাওয়াইলেন। আর একটী বিচিত্র ঘটনা !—বাটীর একটী শেয়াল-কুকুর মরিলে যে অবস্থা হয়, পরিবারবর্গকে সেই অবস্থা করিয়া রাখিলেন, অর্থাৎ বাটীতে রোদনধ্বনি একবারে হইল না। পাড়ার লোক এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে বাটীতে একটু টুঁ-শব্দ নাই দেখিয়া অবাক্ !

তদবধি এ পর্য্যন্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একভাবই দেখিতে পাইতেছি। উক্ত ঘটনার দুই তিন দিন পর হইতে এ পর্য্যন্ত বন্ধুবান্ধবগণ ও ভদ্রলোক ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বুঝাইতে আসিয়া তাঁহার সহাস্য বদন, রহস্যগর্ভ বাক্য, ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম মীমাংসা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে দেখিয়া, ঐ বন্ধুবান্ধবগণ ও অন্যান্য ভদ্রলোক লজ্জিত হইয়া চলিয়া যান। ঐ দুর্ঘটনার তিন চার দিন পর হইতে এ পর্য্যন্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট আমাদের অধ্যয়ন পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ঐরূপ ভাব দেখিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কিরূপে এ ভাবে রহিয়াছেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করেন,— "আমি প্রাচীন কাশীবাসী, সুতরাং আমার বিষয়কার্য্য দেখা-শুনা এবং শিষ্য-শাখা রক্ষা হরকুমারই করিতেন; ঐ হরকুমার আমার একমাত্র পুত্র ও আমার একান্ত অনুগত, ভক্ত এবং রূপবান্, অশেষগুণাকর ও আমার আজ্ঞার একান্ত বশবর্ত্তী। ঐ পুত্রটী যাওয়ায় আমার যে ক্লেশ হয় নাই, ইহা তোমরা মনে করিও না। আমার যে ক্লেশটী হইয়াছে, এ ক্লেশ কাহারও কখন হইয়াছে বলিয়া আমার বিবেচনা হয় না। ক্লেশের বাহ্য ক্রিয়া প্রদর্শন করা অতি মূর্খের কার্য্য, এবং সেই সকল ক্রিয়া করিলে পরকাল নষ্ট হয় ও লোক-হাসাহাসি হয়, এবং পাগল হইয়া মলমূত্রাদির অস্পৃশ্যতা-জ্ঞান বর্জ্জিত হয়। এই হেতু শোকের সেই সকল বাহ্য ক্রিয়া তিরোহিত করিবার জন্য অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আক্ষেপ-উক্তির মধ্যে দুইটী কথা শুনিয়াছি। একটী কথা বলেন এই :—"অন্যকে উপদেশ করিবার জন্য 'মোহভঞ্জন দশক' প্রস্তুত করিয়া হরকুমারকে 'কাশীবাস' গ্রন্থে প্রকাশ করিতে দিয়াছিলাম, তিনি মর্ম্মার্থ সহ সেই 'মোহভঞ্জন দশক' কাশীবাস পুস্তকে

প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই শ্লোকটী যে দেখি আমার পক্ষেই খাটিল! ঃ—

দৃষ্টশ্চেতি কদা স্থতাদিকক্বতাং সেবাং মুদা গৃহ্নতা,
নিত্যং সর্ব্ব-সুপর্ব্ব-গর্ব্ব-নিচয়ো নীতস্ত্বয়া খর্ব্বতাম্।
সর্ব্বে তে তব সন্নিধৌ প্রিয়জনা যাতাঃ পুনঃ সংক্ষয়ং,
গর্ব্বং মা কুরু জীব বর্ব্বর নবো নায়ং তবাবির্ভবঃ॥

মর্ম্মার্থ।

দেখিয়াছি কত জন্মে তোমারে যতনে
সেবিতেছে পত্নী-পুত্র চির-হৃষ্ট-মনে।
সেবা দেখি মনে মনে হইত উদয়,
হেন সেবা দেবতারো ভাগ্যে বুঝি নয়।
ধীরে ধীরে সুখ-রবি অস্তাচলে গেলে
চেয়ে দেখি অকস্মাৎ ভাগ্যনাশ-কালে,
যত প্রিয়জন ফেলি একাকী তোমারে
লুকাইল কালগ্রাসে চোখের উপরে।
নব আবির্ভাব তব নহে এই ভবে,
রে জীব! বর্ব্বর! ত্যজ বৃথা গর্ব্ব তবে।

তাঁহার অপর উক্তি এই ঃ—"আমি বিশ্বনাথের নিকট মনের সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, ঃ—

সমাশ্লিষ্টঃ স্পষ্টৈরহমহ মহাপাতকশতৈঃ,
পিতা ত্বং পাতা ত্বং ভব তব কৃপাপাত্রমখিলম্।
ততঃ স্যাৎ স্বৈরং মেঽমৃতমমৃতলাভৈকসদনং,
কদা যামি স্বামিন্ বিষয়গ-দুরাশা-প্রশমনম্॥

মর্ম্মার্থ।

যে দিন হইল সৃষ্টি সেই দিন হ'তে
সত্য বটে লিপ্ত আমি মহাপাতকেতে ;
কিন্তু ওহে দেব-দেব ! এ বিশ্ব-ভিতর,
পিতা তুমি পাতা তুমি আছ নিরন্তর।
সবাই কৃপার পাত্র এই বিশ্বে তব,
পাতকী আমিও তাই মুক্তি-ধন পাব।
কিন্তু কোন্ জন্মে পা'ব সেই মুক্তি-ধন,
কোন্ জন্মে হ'বে ভব-বন্ধন-মোচন,
কোন্ জন্মে বল সেই মুক্তি দিতে মোরে
বিষয় দুরাশা মোর ছেড়ে যাবে দূরে ?

এক্ষণে নিশ্চয় বুঝিলাম, এই প্রার্থনাটী বিশ্বনাথের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। নতুবা আমার বিষয়-তৃষ্ণা-নিবৃত্তির জন্য হরকুমারকে লইবেন কেন ? হরকুমার বেঁচে থাকিলে তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য আমার মরণকাল পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র বিষয়-তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হইত না। আমি যে বাল্যাবধি ৺বিশ্বনাথের একান্ত অনুগত ? তাঁহারই একান্ত সেবা করিয়া যে হরকুমারকে পাইয়াছিলাম ? এস্থলে আমার জীবন সত্ত্বে হরকুমারকে হরণ করিবেন কেন ? তবে ইহাতে ইহাই আমার অবধারণ হইয়াছে, তিনি আমার বিষয়-বাসনা-নিবৃত্তিরূপ পরম ইষ্ট করিবার জন্যই এই কার্য্য করিয়াছেন।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শোকের কার্য্য কেবল দুইটী দেখা যায়। শাস্ত্রী মহাশয়ের ৺কাশীলাভের পর, তাঁহার সহিত যে বাটীতে থাকিতেন, সেই বাটীটী পরিত্যাগ করিয়া নূতন একটী বাটী স্বয়ং খরিদ

ক্রমতঃ দশ দিনের মধ্যেই সেই নিজ খরিদা বাটীতে উঠিয়া যান ; এবং একাকী থাকিলে কখন কখন এই তিনটী শ্লোক পাঠ করেন :—

ত্বং পাষাণসুতা পিতা পশুপতিঃ স্থাণুঃ কদা বা তনু-
স্তস্মাৎ স্নেহলবোঽপি নাস্তি যুবয়োর্ভৃত্যেন নির্দ্ধারিতম্।
শ্রীপাদস্য তথাপি চিত্তমনিশং সেবার্থি জানামি তৎ,
কর্ত্তুং কিঙ্করমাশু শিষ্টনিকরং যুষ্মৎপটুত্বং পরম্॥
পাতিত্যে সতি পার্ব্বতীপ্রিয় পরাং প্রাপ্তানপি ত্বৎপুরীং,
স্পৃষ্ট্বা তারকমন্ত্রমন্তসময়ে কর্ণে প্রভো নার্পয়েঃ।
তস্মাৎ কিং বিদধাসি মদ্গতমহাপাপস্য নাশেচ্ছয়া,
ভোগং যোগবিযুক্তদাসহৃদয়ে প্রেয়ো বিয়োগোদ্ভবম্॥
স্বস্মিন্ স্বীকুরুষে যদি ত্রিজগতাং তাতোঽপি মৎপুত্রতাং,
তাদ্রূপ্যেণ বিরাজসে চ যদি মে স্বান্তে নিশান্তে চিরম্।
শক্নোম্যদ্য তদা ত্বদেকগতিকো জীবন্মৃতো জীবিতুং,
নানারূপধৃতো ক্ষমত্বমপি যৎ ত্বয্যেব কাশীধব॥

মর্ম্মার্থ।

যে হরকুমার মম একমাত্র সুত,
রূপেতে কুমার সম সর্ব্বগুণযুত।
হে শিব যতনে অতি তোমারি সেবায়,
বারশ বিরাশী সালে তার জন্ম হয়।
বত্রিশ বরষে তা'রে হরণ করিলে,
দত্তাপহারীর দোষ কেন স্বীকারিলে'।
আশুতোষ তব দোষ নহে এ সকল,
বিচারে বুঝিনু সব নিজ কর্ম্মফল।

যা হ’বার হইয়াছে সে কথা বৃথাই,
ভব তব সন্নিধানে এই ভিক্ষা চাই ;
দীনবন্ধু দয়াময় নাম তুমি ধর,
এজন্য মনের আশা জানায় কিঙ্কর ;
ওহে বিশ্বরূপ মম পুত্ররূপী হ’য়ে
হেসে এসে বস যদি দাসের হৃদয়ে।
তবে ত বাঁচিতে পারে তব পদাশ্রিত,
হয়েছে জীবন্মৃত হারাইয়ে সুত।

ঋষিকল্প ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এরূপ মানসিক কষ্ট ও পরম শিব-ভক্ত ধার্ম্মিক হরকুমার শাস্ত্রীর অকালমৃত্যু দেখিয়া আমাদের যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহা এই,—

যদা গ্লানির্হানির্ভবতি বিদুষাং সৎপথজুষাং,
কলেস্তত্তৎকালে বদতি বলবত্ত্বং বিধিবচঃ।
ময়া কিন্ত্বেতস্মিন্ মিতিকরণতা্যৈব বিদিতা,
গুরোর্দৃষ্ট্বা গ্লানিং তনয়তনুহানিস্ত্বসময়ে ॥

———

তদীয় শিষ্য ও ছাত্র
শ্রীদক্ষিণাচরণ তর্কনিধি।

সম্পূর্ণ।

সমালোচনা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন

মহাশয়ের কাশীবাস।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় উপরি-উক্ত নামে সম্প্রতি একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক, পরম ধার্ম্মিক এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণের আদর্শ-পুরুষ। তাঁহার ৺কাশীবাস উপলক্ষে প্রয়োজনীয় তদীয় কার্য্যকলাপ, ধর্ম্মমত এবং ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস প্রভৃতি এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এই দার্শনিক মহাপুরুষের প্রত্যেক কার্য্যই শ্রদ্ধার সহিত আলোচনার যোগ্য। আমরা এই গ্রন্থসঙ্কলয়িতা, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অন্যরূপ ছাত্র—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ভাষাতেই বলিতেছি—

অস্মদ্গণের মস্তকের চূড়া পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লী পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসার্থ গমন করিবার পর হইতে, দেশের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক সর্ব্বদাই আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া আসিতেছি, যাহাতে বঙ্গদেশে তাঁহার স্মরণ-চিহ্নরূপে একখানি পুস্তক লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু এই কার্য্যটী সম্পন্ন করা আমরা নিতান্ত সহজ জ্ঞান করিতে পারি নাই। কারণ, কেবলমাত্র সনতারিখ সহযোগে বাহ্যঘটনাবলী সমাবেশ, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নহে। আমাদের বিশ্বাস এই, যাঁহার জীবনে যে অংশে অলৌকিকত্ব, চরিতাবলী লিপিবদ্ধ করিতে হইলে তাঁহার জীবনের সেই

অংশ বিষদরূপে বিবৃত করা সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনের যাহা অলৌকিকত্ব, তাহা সর্ব্বসাধারণের অনুভূত হইবার বস্তু নহে। শাস্ত্রতত্ত্বে দীর্ঘকাল শ্রম করার পর, শাস্ত্রোক্ত প্রথায় যুক্তিবাদ পর্য্যালোচনা করিবার পক্ষে যাঁহারা তীক্ষ্ণদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অলৌকিকত্ব তাঁহারাই মাত্র অনুভব করিবার অধিকারী। যাঁহার অলৌকিকত্ব অনুভব করিতে হইলে, তুল্য পথের পথিক হইয়া অগ্রে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া লইতে হয়, সর্ব্বসাধারণকে তাঁহার অলৌকিকত্ব সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করা সম্ভবপর হইতে পারে না। জীবনের যে যে অংশ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই মাত্র এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অতএব, এই পুস্তকখানি প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবনচরিত নহে। জীবনের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পরিচায়ক মাত্র। যোগ্যতার ব্যক্তিকর্ত্তৃক ভবিষ্যতে জীবনচরিত রচিত হইলে, এইগুলি তাহার উপকরণরূপে গৃহীত হইতে পারিবে।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনে যেন তিনটী জীবনের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। কবিজীবন, অধ্যাপকজীবন ও ঋষিজীবন। ন্যায়রত্ন মহাশয় আপনার কবিজীবনকে কোনওরূপ প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনে নিয়োগ করেন নাই। কিন্তু শেষোক্ত দুই জীবনে রাঢ়ে বঙ্গে সর্ব্বত্র তাঁহার ছাত্র, শিষ্য এবং ভক্তসম্প্রদায় পরিগঠিত। আমরা এই পুস্তকে উক্ত তিন জীবনেরই কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কাল এক্ষণে ভাল নহে। দেশের হিতকর বোধে শিক্ষামার্জ্জিতবুদ্ধি, পককেশ মনীষিগণ যে বিষয়ের শিক্ষক, অসম্যক্‌-পরিপক্কবুদ্ধি, আত্মাভিমানী, যুবক এক্ষণে অনেক ক্ষেত্রে সেই বিষয়ের সমালোচক। পথের প্রকৃত পথিকে যে বিষয়ের তত্ত্বাতত্ত্বের নির্দ্ধারক, স্বতন্ত্র-পথচারী, লৌকিক-যুক্তি-সর্ব্বস্ব, পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি সেই বিষয়েরই হয় তো পরীক্ষক। এই-

রূপ স্বস্বপ্রধান বিচারক-পরিব্যাপ্ত সময়ে, সকল সিদ্ধান্ত সকলের নিকট সমানভাবে পরিলোকিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি দেশের উপকারার্থ আত্মজ্ঞানমতে চর্চ্চা করা আমাদের পক্ষে অকর্ত্তব্য নহে, এইরূপ বিশ্বাস থাকায় এই পুস্তকখানি আমরা স্বাধীনভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এবং স্বদেশবাসীদিগের জন্য ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি,

শ্রীশঙ্করার্পিতমনঃ-সুমনঃ-সমান-
রাখালদাসচরিতস্য নিবন্ধসিন্ধোঃ।
শ্লেষোক্তিযুক্তিচয়চারুহয়োপবিষ্টা
ধর্ম্মিষ্ঠবৃদ্ধবুধজুষ্টপথং লভন্তাম্॥

একজন আদর্শ পিতার পুণ্যকাহিনী সকল বর্ণন করিতে উপযুক্ত পুত্রের যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ প্রকাশ করা উচিত হয়, পূজ্যপাদের পুত্র কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত হরকুমার শাস্ত্রী তাহা সর্ব্বতোভাবে করিয়াছেন। এই পুস্তক-সম্পাদনে তিনি আমার অদ্বিতীয় সহায়। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত একটী লেখকের আদ্যোপান্ত সহায়তা না পাইলে, আমার মনের অভিলাষ এ ভাবে পূর্ণ করিতে পারিতাম না; পুস্তকখানি বর্ত্তমান অবস্থায় প্রকাশিত হইত না।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ভক্ত দ্বৈতবাদী; তিনি বিবিধ যুক্তি দ্বারা অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন; তাঁহার আনন্দ-বিচার এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ। ব্রহ্ম আনন্দময়, এ বিষয় পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে।

অনেক স্থলে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। যথা—মৃত্তিকাময়ো ঘটঃ। ব্রহ্মকে কি আনন্দের বিকার বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে? যদি তাহা হয়, তবে 'নিত্য' হন কিরূপে? এই আশঙ্কা নিরকরণার্থ সূত্র করা হইয়াছে, বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ। 'আনন্দময়' শব্দটী বিকার-

বোধক, সুতরাং ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইতে পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষ করিও না। প্রাচুর্য্যার্থে পূর্ব্বোক্ত 'ময়ট' প্রত্যয় সিদ্ধ। যথা—অন্নময়ো যজ্ঞঃ।

ব্রহ্ম প্রচুর আনন্দের স্বরূপ, ইহাই কি তবে বুঝিতে হইবে? এই আশঙ্কা-নিরাকরণার্থ ব্যাসদেব সূত্র করিতেছেন, তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ। ব্রহ্ম প্রচুর আনন্দের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। তিনি প্রচুর আনন্দের স্বরূপ নহেন। 'নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' এই বাক্যের ব্যাখ্যাকালে আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছি, ব্রহ্মে যত 'আনন্দ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেগুলি ণিজন্ত করিয়া তদুত্তর কৃৎপ্রত্যয় করতঃ সিদ্ধ। এক্ষণে অভিজ্ঞগণ বুঝিতেছেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, ব্যাসদেবও তাহাই বলিলেন। শ্রুতিও তাহাই আছে। যথা,—'এষ হ্যেবানন্দয়তি।'

সুখ নিশার ধর্ম্ম নহে, জীবের ধর্ম্ম। কিন্তু নিশা যদি প্রচুর-ভাবে তাহা জন্মাইতে পারে, তবে 'সুখ-নিশা' এরূপ প্রয়োগ হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও ঠিক ঐ নিয়ম। আনন্দ জীবের ধর্ম্ম, ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্ম প্রচুর-ভাবে তাহার জনক হন বলিয়া 'আনন্দো ব্রহ্ম' 'আনন্দময়ং ব্রহ্ম' এই সকল প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত, সুখ 'জন্য' পদার্থ, ইহা 'ধর্ম্মাৎ সুখং' ইত্যাদি শ্রুতি-বলে জানা যায়। "ধর্ম্মাৎ সুখং" এই শ্রুতির ব্যাখ্যা অদ্বৈতবাদীরা করেন—'ধর্ম্মাৎ জীব-সুখম্।' এরূপ অর্থ করিলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইল এবং কার্য্যকারণ-ভাবে গৌরব দাঁড়াইল। 'আনন্দ' বা 'আনন্দময়' শব্দের 'আনন্দজনক' অর্থ দ্বৈতবাদিগণকেও করিতে হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ অর্থ লাক্ষণিক নহে। আপ্ত-বাক্য ও সূত্র নিষ্পন্ন হওয়ায় উহা শক্যার্থ। অতএব দ্বৈতব্যাখ্যারই স্বরস অধিক। শ্রুতি-সমন্বয়কালে এ বিষয়ে আরো বিচার করা হইয়াছে।

পরম ধার্ম্মিক হাতুয়ার মহারাজ এই মহাপুরুষকে ৺কাশীবাস করাইয়া-ছেন। এক্ষণে তাঁহার অনুরূপা মহিষী হাতুয়ার মহারাণী তাঁহাকে

সেইরূপ সম্মানের সহিত বৃত্তিদান করিয়া অনন্ত পুণ্যসঞ্চয় করিতেছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং তদীয় যোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত হরকুমার শাস্ত্রিমহাশয় ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য হাতুয়ার মহারাণী, শ্রীলশ্রীযুত কুমার বাহাদুর এবং অমাত্য-বর্গকে নিত্যাশীর্ব্বাদ করিয়া ৺কাশীবাসের বিমলানন্দ ভোগ করিতেছেন। আমরা এই পুণ্যশীলা রাজ্ঞীকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করি।

এই গ্রন্থের মূল্য এক টাকা। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস-ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থ প্রাপ্তব্য।

বঙ্গবাসী,

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩১২ সাল।

"মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাশীবাস"— এই নামে অভিহিত করিয়া ভট্টপল্লীর নৈয়ায়িকপ্রবর মূলাজোড় সংস্কৃতকলেজের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চরিতাবলী সংকলন করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়েরই সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত হরকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা, সার্ব্বভৌম মহাশয় ঐ পুস্তকের লিখন-কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন, ভূমিকায় ইহারও উল্লেখ দেখা যায়। যিনিই পুস্তকখানির লেখক হউন, তিনি একজন সাহিত্য-সেবী অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। কাব্যে ও দর্শনে লেখনী সমানভাবে খেলিয়াছে। সেই কাব্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নব্যপ্রাচীন নানা অবস্থার নানা রস-গাথা দর্শিত। বিবেকী ন্যায়-রত্ন মহাশয় কাশীবাস করিয়া ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়াছেন,—

স্থিতা ব্যর্থালাপৈঃ পরমরসহীনৈব রসনা
যদা শক্তির্জাতা বচনরচনায়াং তদবধি।

পিতঃ শম্ভো মাতর্নগ-পতিসুতে ভো গণপতে !
কুরুধ্বং মৎপদ্যৈঃ স্তুতিনতিপরৈস্তাং রসযুতাম্ ॥

মর্ম্মার্থ।

যে দিন জনমি' হেথা শৈশবে ফুটিল কথা
তদবধি এ সুদীর্ঘ কাল,
নিত্য ব্যর্থ আলাপনে সারশূন্য সম্বোধনে
নিয়োজিত ছিল বাক্যজাল।
নিদারুণ মোহবশে মজেনি পরম রসে
একদিন (ও) রসনা আমার,
হে গিরিশ ! গিরিসুতে ! হে কৃপালো গণপতে !
রাখ ভিক্ষা আজি একবার,
স্তুতি-নতি-গুণ-গানে পারি যাহে এতদিনে
রসনারে করিতে সরস।
সেই শক্তি বিতরণ ভগবতি ! ভগবন্ !
কর দাসে হ'য়ে কৃপাবশ ॥

আবার, যৌবনাবস্থায় শ্বশুরালয়ে রহস্যের পাত্রী কোনও ললনাকে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করাইবার জন্য যৎকালে কবিতা রচনা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তৎকালে ন্যায়রত্ন মহাশয় পরম রসিক। সেকালে তিনি রচনা করিয়াছিলেন,—

বিম্বৌষ্ঠি নিম্বতরু-নীরসপাদপাদৌ
সর্পেঽপি সর্পতি মৃগাক্ষি তবাক্ষিযুগ্মম্।
জানাসি মাং কিমু ততোঽপ্যধমং সগর্ব্বে !
যত্ত্বং কৃশাঙ্গি কুরুষে ময়ি দৃষ্টিরোধম্ ॥

মর্ম্মার্থ।

বিম্ব-ওষ্ঠি ! বড়ই মিষ্টি, এইটী দেখি চোখে,
তেতোর গুরু, নিমের তরু, মুখ ঢাক' না দেখে!
নাই লো মিঠে, শুক্‌নো কাঠে, দেখ্‌তে তাও হয়,
সাপ খেলালে, তা'ও সেকালে, ঘোম্‌টা খোলা রয়!
ওলো ধনি, গরবিণি, তোর চোখে কি দীন
সাপের চেয়ে, কাঠের চেয়ে, নিমের চেয়ে হীন ?
এ কি ভঙ্গি, তোর কৃশাঙ্গি, আমি পড়্‌লে চোখে,
ফেল অম্‌নি, বদন খানি, ঘোম্‌টা দিয়ে ঢেকে!!

এই জীবনচরিতে এইরূপ নানা রস ও নানা বিষয়ের সমাবেশ থাকায়, ইহা নব্য প্রাচীন সকলেরই প্রীতিবর্দ্ধক হইবে। ন্যায়রত্ন মহাশয় কিরূপ বংশে জাত, পূর্ব্বাপর কিরূপ জীবনযাপন করিয়াছেন, কিরূপ ধর্ম্মভীরু, কিরূপ দেব-ভক্ত, কিরূপ শাস্ত্র-মীমাংসক, তন্ত্রে মন্ত্রে তিনি কিরূপ উপদেশ করিয়াছেন, সমালোচক-ভাবে তিনি সাহিত্যের উপর, সমাজের উপর, ধর্ম্মবক্তার উপর, সংস্কারকগণের উপর কিরূপ বাক্‌প্রয়োগ করিয়াছেন, তৎসমুদয় এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনুমানখণ্ডের পোষকতায় এবং অদ্বৈতবাদখণ্ডন-প্রস্তাবে যে সকল পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের জন্য নহে।

ন্যায়শাস্ত্রের পোষকরূপে অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন প্রস্তাবে ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, যে, সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান হইলে, সে জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান নহে। সাকারোপাসনার শেষে ঐরূপ জ্ঞান হয়। তৎপরে "পরা ভক্তি" ঘটে। তৎপরে (ব্রহ্মগত অসাধারণ যাবৎ ধর্ম্মের দ্বারা) ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্ম ঘটপটাদি বস্তুসমূহ হইতে ভিন্ন। তিনি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ। এইরূপ ধর্ম্ম সকল তাঁহার

প্রকৃত তত্ত্ব। অতএব এক ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে (বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য-মুদ্রায়) সর্ব্বতত্ত্ব সাক্ষাৎকারও ঘটিয়া থাকে। এই কারণে নারদাদি সর্ব্বজ্ঞ। পরাভক্তিবলে এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে, তৎপরবর্ত্তি-উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (অর্থাৎ মুক্তির সাক্ষাৎকারণীভূত জীবসম্বন্ধীয় বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞান হয়।) প্রমাণ যথা,—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানন্তি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

ব্রহ্মজ্ঞানের পর তৎপরবর্ত্তি-উপায় লাভ করা যায়, এরূপ অর্থ কেন করা হইল? ব্রহ্মজ্ঞানের পর মুক্তি হয়, এরূপ অর্থ করা হইল না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই, ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই "জ্ঞান-" পদ-বাচ্য। অর্থাৎ সেইজ্ঞান না হইলে মুক্তি হইবে না। কেবল ব্রহ্মই ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন। ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ। নিখিল বস্তুরূপ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ যেমন ব্রহ্ম, দেহরূপ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ সেইরূপ জীব। প্রমাণ যথা,—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥

এই দুই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে কাহার জ্ঞান পূর্ব্বপশ্চাৎ, তাহা অগ্রেই সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। অদ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত বহু-শ্রুতি, ভগবদ্‌বাক্য, ব্যাসসূত্র প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থমধ্যে ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, সেই সেই প্রমাণ সকল এই সিদ্ধান্তের বিরোধী বা বাধক নহে, পরন্তু পোষক।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যে পথে উঠিয়া শ্রুতিসমন্বয় করিয়াছেন, সেই পথ মাত্র কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম। এ সম্বন্ধে কোনও মতামত আমরা প্রকাশ করিব না। চিরদিনই বিভিন্ন দর্শনের প্রচলন আছে। অতএব একপক্ষে শঙ্করাচার্য্যাদির কৃত মীমাংসার উপর কিছু কটাক্ষ আসিলেও, অন্যপক্ষে গৌতমকণাদাদি মহর্ষি-কৃত মীমাংসাসমূহ কিরূপ বিশুদ্ধ ও ভ্রান্তিশূন্য, তাহা দর্শান হইয়াছে। যিনি ইহাই দর্শাইতেছেন, তিনিও সামান্য ব্যক্তি নহেন। শিক্ষার শেষাবস্থায় উঠিয়া বিদ্যার্থিগণ যাদৃশ ব্যক্তির নিকট চরমোপদেশসকল সংগ্রহ করিয়া থাকেন, যিনি শাস্ত্রজ্ঞ-গণকে অশেষ প্রকারে পরিতৃপ্ত করিয়া শেষাবস্থায় কাশীবাস করিতে-ছেন, যাঁহার পাণ্ডিত্যবিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞগণের মতদ্বৈধ নাই, শাস্ত্রীয় মীমাং-সার প্রামাণিকতা নিশ্চয় করিবার জন্য দেশবাসী যাদৃশ ব্যক্তির স্বাক্ষরকে অমূল্য জ্ঞান করেন, বিদ্যার্থিরূপে যাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া লোকে প্রাধান্য-লাভে সমর্থ, সেই পণ্ডিতকুলতিলক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরিণত-চিন্তার ফলে যে মীমাংসা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সমকক্ষ অভিজ্ঞ কেহ থাকিলে তাঁহারই সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা শোভা পায়, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মতা-মতের মধ্যে আমরা এইটুকু প্রকাশ করিতেছি, এই জীবনবৃত্তান্তে কাব্য, দর্শন, তান্ত্রিকতা, দেবভক্তি প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে পক্ষধর মিশ্রের প্রতি নৈয়ায়িক-পুঙ্গব ৺রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের সেই গর্ব্ব-বিস্ফুরিত কবিতাটী মনে পড়ে,

“কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে,
তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে,
কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে॥”

হাতুয়ার মহারাণীর নামে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "কাশীবাস" পুস্তক উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ইঁহার স্বর্গীয় স্বামী মহিমান্বিত মহারাজ ৺কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী পরমশ্রদ্ধা সহকারে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সপরিবারে পবিত্র কাশীধামে বাস করাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মশীলা রাজ্ঞী এবং মহারাজের ধার্ম্মিক অমাত্যেরাও সেই শ্রদ্ধা বিস্মৃত হন নাই, ইহা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত পাঠে জ্ঞাত হইয়া আমরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলাম। অন্নপূর্ণা রূপিণী মহারাণীকে, কুবের তুল্য রাজপুত্রকে, লক্ষ্মীসমা রাজকুমারীকে এবং মহারাজের ধার্ম্মিক অমাত্যবর্গকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিয়া পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র যোগ্যতম শ্রীযুক্ত হরকুমার শাস্ত্রিমহাশয় শতায়ুঃ লাভ করতঃ পবিত্র কাশীধামে মনের সুখে কালাতিপাত করুন, ইহাই আমরা ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

(হিন্দু পত্রিকা)

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য।

নারিকেলডাঙ্গা,
কলিকাতা।
১৭ই ভাদ্র ১৩১২।

নমস্কার-পূর্ব্বক-সবিনয়-নিবেদন

আপনার প্রণীত "মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "কাশীবাস" নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি ও ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি। এই গ্রন্থ এতদ্দেশের একজন পণ্ডিত-চূড়ামণির জীবন-বৃত্তান্ত। বিশেষ ইহাতে সেই অসামান্য ব্যক্তির রচিত কতকগুলি সুন্দর কবিতা সন্নিবেশিত আছে, এবং গ্রন্থ-

খানি অতি সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় লিখিত। সুতরাং ইহা অবশ্যই জনসমাজে সমাদৃত ও বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে একটী অপূর্ব্ব রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইতি

ভবদীয়

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর সাহেবের মন্তব্য।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "কাশীবাস" নামক গ্রন্থ পাইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। দেশের একটী পণ্ডিত-চূড়ামণির সিদ্ধান্তাবলী সহ তাঁহার জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় এবং গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত হরকুমার শাস্ত্রী মহাশয় সৎছাত্র ও সৎপুত্রের কার্য্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই পুস্তক বাঙ্গালীর বড়ই আদর করিবার বস্তু। যে রাজসংসার ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পরিজনবর্গ সহ নিশ্চিন্ত-ভাবে কাশীবাস করাইয়াছেন, এই "কাশীবাস" পুস্তকের সহিত সেই রাজ-সংসারকেও ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

বন-আবাস,
বর্দ্ধমান।
১৬ই চৈত্র, ১৩১২। } শ্রীবনবিহারী কপূর।

কাশীবাস গ্রন্থ সম্বন্ধে বেঙ্গলী সংবাদপত্রের অভিমত।

(বঙ্গানুবাদ)

মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের "কাশীবাস" অভিধেয় একখানি মনোরম পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভট্টপল্লী-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ইহার সঙ্কলনকর্ত্তা এবং কলিকাতার বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক। ইহাতে ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়দর্শনবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় হিন্দুশাস্ত্রসমূহে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন, তর্কশাস্ত্রে তাঁহার অসীম ক্ষমতা, তদ্বিষয়ে পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এতাদৃশ ধার্ম্মিকবর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের জীবনী নানাবিষয়ে ও সদুপদেশ পূর্ণ শিক্ষাপ্রদ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। জগৎপিতার প্রতি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের অচলা ভক্তি। তাঁহার অকপট দেশহিতৈষিতা এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় এই পুস্তকে পরিবর্ণিত হইয়াছে; প্রবীণ পণ্ডিত মহাশয় স্বরচিত কতিপয় সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা তত্ত্ববিষয়ে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই শ্লোকগুলির সরল বঙ্গভাষার পদ্যানুবাদ সাধারণ পাঠকবর্গের সবিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে; বিশেষতঃ ইহার অন্তর্গত "অনুমানখণ্ড" ও "অদ্বৈতবাদখণ্ড" সংস্কৃতশিক্ষিত ছাত্রগণের বিশেষ উপকারে আসিবে। পণ্ডিত রাখালদাস এক্ষণে পুণ্যধাম বারাণসী-ক্ষেত্রে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ করিবার অভিলাষে সপরিবারে কাশীবাস করিতেছেন; হাতুয়ার স্বর্গীয় মহারাজ কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী তাঁহার এই সাধু অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রচুর দান করিয়া গিয়াছেন; তদর্থ কাশীধামে অপর কাহারও নিকট দান প্রতিগ্রহ করিতে না হয়, মহারাজের

বৃত্তিদানের তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য; এই সংবাদ শ্রবণে প্রত্যেক বঙ্গবাসী হিন্দুসন্তান উক্ত মহারাজের নামে অগণ্য সাধুবাদ অর্পণ করিবেন। কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যে, পণ্ডিতমহাশয়ের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী পুত্রের অনুকূলে উক্ত হাতুয়ার বিধবা মহারাণী স্বামীপ্রদত্ত দানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রাচান হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের প্রেমিক পাঠকমণ্ডলী এই পুস্তক পাঠে বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বৃহস্পতিবার,

বেঙ্গলী, ১৯শে অক্টোবর, ১৯০৫।

(ইণ্ডিয়ান নেশনের অভিমত)

মূল ইংরাজীর বঙ্গানুবাদ।

মহামহোপধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম সংগৃহীত একখানি বাঙ্গালা পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাটপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, যিনি এক্ষণে পবিত্র বারাণসীধামে বাস করিতেছেন, এই পুস্তকখানি সেই ধর্ম্মাত্মার জীবন-চরিত। হাতুয়ার স্বর্গীয় মহারাজ এই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন। কাশীধামে অপর কাহারও দান গ্রহণ না করিয়া পণ্ডিতমহাশয় যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে কাশীবাস করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি (মহারাজ) পণ্ডিত মহাশয়কে প্রচুর বৃত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্ত তথাকার বিধবা মহারাণী উক্তপণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রের জন্য স্বামীদত্ত বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতের হস্তে যেরূপ হওয়া উচিত, এই পুস্তককখানি সেইরূপ সুললিত হইয়াছে;

ইহার গর্ভস্থ সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ অতি সুন্দর; দর্শন-শাস্ত্রের মহিমা ইহাতে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান নেশন—১৮ই ডিসেম্বর,
সোমবার ১৯০৫।

"মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাশীবাস" নামক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরকুমার শাস্ত্রিমহাশয়ের সাহায্যে ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় গ্রন্থখানির সঙ্কলন করিয়াছেন। ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্নের নাম বঙ্গে কাহারও অবিদিত নহে। তাঁহার অসাধারণ বিচারশক্তি, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, অপূর্ব্ব কাব্যরসজ্ঞতা, প্রশংসনীয় সমাজহিতেচ্ছা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ, দেবভক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞানাদি বিবিধ গুণের বিষয় আলোচ্য গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভট্টপল্লীর ঠাকুর মহাশয়দিগের প্রাচীন কাহিনীও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কি ভাবে জীবন-যাপন করা উচিত, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পবিত্র জীবনচরিতে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্ব-রচিত বিবিধ-বিষয়ক বহু সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক সরল ও সুমধুর পদ্য বঙ্গানুবাদ সহ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকখানি সাধারণ পাঠকবর্গের যেমন চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, সেইরূপ ন্যায়শাস্ত্রের, বিশেষতঃ অনুমান-খণ্ডের সূক্ষ্ম মর্ম্ম ইহাতে দক্ষতা সহকারে বিবৃত হওয়ায় ইহা দার্শনিকগণেরও মনোরঞ্জক হইবে বলিয়া আমাদিগের ধারণা। হাতুয়ার পরলোকগত মহারাজ

৺কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী বঙ্গদেশ হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংসার উঠাইয়া কাশীতে স্থাপন করিয়াছেন, এবং বিনা প্রতিগ্রহে তথায় বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এজন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহারই সহধর্ম্মিণীর নামে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট দার্শনিক বিচার-সমূহের মধ্যে "অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন" প্রসঙ্গ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কিরূপ প্রতিভা-প্রকাশক, অভিজ্ঞ দার্শনিক-গণের তাহা বিচার্য্য। আমরা কোন প্রকার মতামত প্রকাশ না করিয়া এ স্থলে বিচার-প্রক্রিয়ার উল্লেখ মাত্র করিতেছি। সর্পকে রজ্জু বলিয়া বোধ হইতে পারে বলিয়া ব্রহ্মকে নিখিল বস্তু বলিয়া বোধ হইতে পারে, ব্রহ্ম ব্যতীত প্রকৃত পক্ষে অন্য কোনও বস্তু নাই, অদ্বৈতবাদীদিগের এ সিদ্ধান্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, ভ্রম হইতে হইলে উভয় বস্তুই থাকা চাই। সর্পও আছে, রজ্জুও আছে, কাজেই সর্পে রজ্জুভ্রম হইতে পারে। ঘটপটাদি যদি প্রকৃতই না থাকে, তবে ব্রহ্মে ঐ সকল বিষয়ের ভ্রম হইতে পারে না। "সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা" এই প্রমাণ দ্বারা যেমন অন্য বাদ্যের অস্তিত্ব লোপ পায় না, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই প্রমাণ দ্বারাও সেইরূপ সর্ব্ববস্তুর অস্তিত্ব লোপ পায় না। "ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি" এই জাতীয় প্রমাণ যেমন পদার্থ-সাধক নহে, "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই জাতীয় প্রমাণও সেইরূপ পদার্থ-সাধক নহে। "আপো নারায়ণঃ স্বয়ং" এই বাক্যও যেরূপ, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই জাতীয় প্রমাণও তদ্রূপ।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলির দ্বারা বাদ্যের, ঘটের ও জলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় না। কারণ, বাধক আছে। সেইরূপ বাধক আছে বলিয়াই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যেও যে বিভিন্ন বস্তুর উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সে বাধক এই, "সাম্যমুপৈতি", "সাধ-

শ্যামাগতাঃ” ইত্যাদি প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, মুক্ত জীব ব্রহ্মের সমান হয়, ব্রহ্ম হয় না। সাদৃশ্য বা তদ্‌বাচী শব্দ সুস্পষ্ট ভেদ-সাধক। ইহাদের লক্ষণা না করিয়া আপাততঃ অভেদ-বোধক বাক্যের লক্ষণাই যুক্তিযুক্ত। তাহার হেতু এই, জীব ব্রহ্ম হইয়া গেলে “ব্রহ্মের সমান হইয়াছে” বলা যায় না। কিন্তু জীব ব্রহ্মের সমান হইলে “ব্রহ্মই হইয়াছে” বলা যায়। তখন লক্ষণা করিতে হয় “ব্রহ্মের সমান হইয়াছে।” “তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” “ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতি,” এ সকল প্রয়োগ লক্ষণাপর। এতদ্ব্যতীত লৌকিক অলৌকিক প্রয়োগে এবং চাক্ষুষাদি অবলম্বনে বহু ঘট, বহু জীব, বহু পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে, বহু অবিদ্যাদির দোহাই দিয়া এক বস্তুতে বহুত্বের উপপত্তি করা যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না। যেখানে গত্যন্তর নাই, ইহা বাদী প্রতিবাদী উভয়ে স্বীকার করিয়াছেন, সেইখানেই বিশেষণের বহুত্ব লইয়া ধর্ম্মীর বহুত্ব অবধারণ করা হয়। যথা, “বহবঃ শ্রুতয়ঃ’ “বহ্ব্যো দিশঃ” ইত্যাদি। কিন্তু স্বারসিক ব্যাখ্যা দ্বারা এক পক্ষ যে স্থলে পদার্থের উপপত্তি করিতে সমর্থ, সে স্থলে অস্বারসিক ব্যাখ্যা কখনই গ্রাহ্য নহে। কারণ, তাহা হইলে, শব্দগত বহুত্ব লইয়া “একং গগনং বহূনি,” ঐশ্বর্য্যের “বহুত্ব” লইয়া “একো রাজা বহবঃ” এ সকল প্রয়োগও হইতে পারিত। আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিচার-পদ্ধতির অতি সামান্য আভাস প্রদান করিলাম। তিনি গুরু-পরম্পরা-মতে যে শাস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তদনুসারে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার জন্যই আমরা এই অংশের বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম। এ বিষয়ে সম্প্রদায়গত মতভেদ থাকিলেও দার্শনিকগণ গ্রন্থখানিতে আলোচনার যোগ্য বহু বিষয় দেখিতে পারিবেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

হিতবাদী, ১৩ই আশ্বিন, ১৩১২

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাশীবাস।

হাতুয়ার রাজ-সংসার হইতে বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইলে বঙ্গের নৈয়ায়িক-চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং তাঁহার পরিজনবর্গ বঙ্গীয় সন ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসার্থ গমন করেন। বঙ্গদেশে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্মৃতি-চিহ্নরূপে ভট্টপল্লীর নৈয়ায়িকপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় উপরি-উক্ত নামে অভিহিত করিয়া সম্প্রতি একখানি পুস্তক সংকলন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই পুস্তকের প্রাপ্তি-সংবাদ মাত্র আমরা দিয়াছি। কার্য্যগতিকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে বিলম্ব হওয়ায় এতদিন পর্য্যন্ত বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করা হয় নাই। দেখিলাম, জীবনের কেবল বহির্ঘটনাবলীর সমাবেশ এই পুস্তকে নাই, কার্য্য,দর্শন, জীবনচরিত এই তিন নামে পুস্তকখানি অভিহিত-হইতে পারে। এক-জন দেশপূজ্য শাস্ত্রজ্ঞ মহাত্মা দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিরূপ বাক্‌প্রয়োগ করিয়াছেন,তাহা প্রত্যেকের অনুশীলন করা উচিত। আমা-দের সমাজে সকল মত সকলের অনুমোদিত না হইতে পারে, তথাপি একজন অভিজ্ঞ চূড়ামণির মন্তব্য সকল কাহারও মুখপানে চাহিয়া চাপিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে, পুস্তকে চাপিয়া রাখা হয়ও নাই। পুস্তকের ভূমিকায় দেখিলাম, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত হরকুমার শাস্ত্রী মহাশ-য়ের দ্বারা সঙ্কলয়িতা সার্ব্বভৌম মহাশয় পুস্তকের লিখনকার্য্য সম্পন্ন করা-ইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় সুপণ্ডিত এবং সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। এই পুস্তকে তাঁহার লেখনী কাব্যে দর্শনে তুল্য শক্তি প্রকাশ করিয়াছে। দর্শনের মধ্যে "অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে শ্রুতি, ভগবদ্‌গীতা ও ব্যাসসূত্র হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ন্যায়মত সমর্থন করা হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় অদ্বৈতমত চাহেন না। তিনি

সংস্কৃত কবিতায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী তুমি ব্রহ্মময়ী তারা।
শ্রীপদকমলে তোর কিঙ্কর আমরা॥
খণ্ডাইতে যে পণ্ডিতে করে অভিলাষ।
ভেদ বুদ্ধি বিনাশিয়া এ চির-বিশ্বাস॥
তাদের মা তত্ত্বকথা দাসেরা না শোনে।
প্রবেশিয়া সুভীষণ অদ্বৈত-গহনে॥

বসুমতী, ৮ই মাঘ, ১৩১১ সাল।

প্রণ্ডিতপ্রবর শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রদত্ত দীর্ঘপ্রশংসাপত্রের

সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়, আজ আমি যে একখানি পুস্তক পাইয়াছি, উহা একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গুরুভক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পবিত্র লেখনী হইতে উন্মুক্ত সুধাধারা। পুস্তকের নাম "মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাশীবাস।" এই গ্রন্থের গ্রন্থকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম মহাশয় অনবরত ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা দ্বারা যে যশের অর্জ্জন করিতেছেন, দিগন্তবিক্ষিপ্ত সেই যশঃ-পুণ্ডরীকমালার উপরে তিনি এই পুস্তক লিখিয়া স্বর্গীয় সৌরভ বিকীরণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত দিগন্তবিশ্রুতকীর্ত্তি মহামনীষাসম্পন্ন পূজনীয়চরিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন

মহাশয় বাল বৃদ্ধ যুবা কাহারও নিকট অবিদিত নহেন। তাঁহার এই জীবন-চরিতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা যাহা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, সে সমস্ত বিষয় প্রায় সকল পণ্ডিতেরই বিদিতপূর্ব্ব; সুতরাং বলিতে হইবে, এই ইতিহাসগ্রন্থ বর্ত্তমান কালের জন্য না হইলেও উত্তরকালের জন্য উপকারী হইবে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি আছে, তাঁহার মিষ্ট লেখনী যে সুমিষ্ট কবিতা প্রসব করিতে পারে, ইহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। সুখ ও সৌভাগ্যের কথা, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সেই সুমিষ্ট কবিতাগুলির অনুবাদক হইয়াছেন তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কল্যাণভাজন শ্রীমান্ পণ্ডিত হরকুমার শাস্ত্রী। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

———